চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ইমম্**—এই; **বিবস্বতে**—সূর্যদেবকে; **যোগম্**—ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান; **প্রোক্তবান্**—বলেছিলাম; **অহম্**—আমি; **অব্যয়ম্**—অব্যয়; **বিবস্বান্**—বিবস্বান (সূর্যদেবের নাম); **মনবে**—মানবজাতির জনক বৈবস্বত মনুকে; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **মনুঃ**—মনু; **ইক্ষ্বাকবে**—মহারাজ ইক্ষ্বাকুকে; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন।

গীতার গান

ভগবান কহিলেন ঃ

পূর্বে আমি বলেছিলাম, সূর্যকে প্রথম ।
এই সে নিষ্কাম কর্ম অপূর্ব কথন ॥
সূর্য বলেছিল পরে মনুকে স্বপুত্রে ।
ইক্ষ্বাকু শুনিল পরে পরম্পরা সূত্রে ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমি পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে এই অব্যয় নিষ্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলেছিলাম। সূর্য তা মানবজাতির জনক মনুকে বলেছিলেন এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবান *ভগবদ্গীতার* ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। বহু প্রাচীনকালে সূর্যলোক আদি বিভিন্ন গ্রহলোকের রাজাদের ভগবান এই জ্ঞান দান করেন। সমস্ত গ্রহলোকের রাজাদের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে প্রজাপালন করা এবং সেই জন্য তাঁদের সকলেরই *ভগবদ্গীতার* বিজ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে তাঁদের প্রজাদের পারমার্থিক লক্ষ্যের দিকে তাঁরা পরিচালিত করতে পারেন। তাই ভগবানের কৃপায় এই জ্ঞান লাভ করে প্রাচীনকালের রাজারা মানুষকে কামনা-বাসনার জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার পথ প্রদর্শন করতেন। মানব-জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলন করা এবং ভগবানের সঙ্গে তার যে নিত্য সম্পর্ক রয়েছে, সেই সম্বন্ধে অবগত হওয়া। তাই, সকল গ্রহলোকের ও সকল রাষ্ট্রের শাসকবর্গের কর্তব্য হচ্ছে, শিক্ষার মাধ্যমে, সংস্কৃতির মাধ্যমে ও ভক্তির মাধ্যমে জনগণকে এই জ্ঞান বিতরণ করা। পক্ষান্তরে বলা যায়, সকল রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং সমাজের নেতাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিজ্ঞান সকলের কাছে বিতরণ করা, যাতে প্রতিটি মানুষ এই মহাবিজ্ঞানের সুফল অর্জন করতে পারে এবং মানব-জীবনের সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে সাফল্যের পথে অনুসরণ করতে পারে।

এই মহাকাল কল্পে সূর্যদেবের নাম বিবস্বান, তিনিই হচ্ছেন সূর্যলোকের অধীশ্বর। এই সূর্য থেকেই সৌরজগতের সমস্ত গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। *ব্রহ্মসংহিতাতে* (৫/৫২) বলা হয়েছে—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ব্রহ্মা বলেছেন, "সমস্ত গ্রহের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্তি সবিতা বা সূর্য জগতের চক্ষুস্বরূপ। তিনি যাঁর আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হয়ে ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে (শ্রীকৃষ্ণকে) আমি ভজন করি।"

সূর্য হচ্ছেন গ্রহগুলির রাজা এবং বর্তমানে সূর্যদেব বিবস্বান সূর্যগ্রহকে পরিচালনা করছেন। এই সূর্যগ্রহ সমস্ত গ্রহগুলিকে তাপ ও আলোক দান করে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে সূর্য তাঁর কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছেন। এই সূর্যদেবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলে প্রথম শিষ্যরূপে গ্রহণ করে *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান দান করেন। এই থেকে আমরা বুঝতে পারি, *ভগবদ্গীতা* প্রাকৃত পণ্ডিতদের জল্পনা-কল্পনার সামগ্রী নয়, *গীতা* স্মরণাতীত কাল থেকে প্রবাহিত হয়ে আসা ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী।

মহাভারতের শান্তিপর্বে (৩৪৮/৫১-৫২) আমরা *ভগবদ্গীতার* ইতিহাসের উল্লেখ পাই—

ত্রেতাযুগাদৌ চ ততো বিবস্বান্ মনবে দদৌ ।
মনুশ্চ লোকভৃত্যর্থং সুতায়েক্ষ্বাকবে দদৌ ।
ইক্ষ্বাকুণা চ কথিতো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ ॥

"ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান মনুকে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান দান করেন। মানব-সমাজের পিতা মনু এই জ্ঞান তাঁর পুত্র সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর এবং রঘুবংশের জনক ইক্ষ্বাকুকে দান করেন। এই রঘুবংশে শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হন।" সুতরাং, *ভগবদ্গীতা* মহারাজ ইক্ষ্বাকুর সময় থেকেই মানব-সমাজে বর্তমান।

এই পৃথিবীতে এখন কলিযুগের পাঁচ হাজার বছর চলছে। কলিযুগের স্থায়িত্ব ৪,৩২,০০০ বছর। এর আগে ছিল দ্বাপরযুগ (৮,০০,০০০ বছর) এবং তার আগে ছিল ত্রেতাযুগ (১২,০০,০০০ বছর)। এভাবে প্রায় ২০,০৫,০০০ বছর আগে মনু তাঁর পুত্র এই পৃথিবীর অধীশ্বর ইক্ষ্বাকুকে এই *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান দান করেন। বর্তমান মনুর আয়ু ৩০,৫৩,০০,০০০ বছর, তার মধ্যে ১২,০৪,০০,০০০ অতিবাহিত হয়েছে। আমরা যদি মনে করি, মনুর জন্মের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিবস্বানকে *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান দান করেছিলেন, তা হলেও *গীতা* প্রথমে বলা হয় ১২,০৪,০০,০০০ বছর আগে এবং মানব-সমাজে এই জ্ঞান প্রায় ২০,০০,০০০ বছর ধরে বর্তমান। পাঁচ হাজার বছর আগে ভগবান এই জ্ঞান পুনরায় অর্জুনকে দান করেন। *গীতার* বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুযায়ী এই হচ্ছে *গীতার* ইতিহাস। ভগবান সর্বপ্রথম এই জ্ঞান বিবস্বানকে দান করেন, কারণ বিবস্বানও হচ্ছেন একজন ক্ষত্রিয় এবং সূর্যবংশজাত সমস্ত ক্ষত্রিয়ের তিনিই হচ্ছেন আদি পিতা। ভগবানের কাছ থেকে আমরা *ভগবদ্গীতা* প্রাপ্ত হয়েছি বলে *ভগবদ্গীতা বেদেরই* মতো পরম তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত—এই জ্ঞান অপৌরুষেয়। বৈদিক জ্ঞানকে যেমন যথানুরূপভাবে গ্রহণ করতে হয়, মানুষের কল্পনাপ্রসূত ব্যাখ্যা সেখানে প্রযোজ্য হয় না, *ভগবদ্গীতাও* তেমনই জড় বুদ্ধিপ্রসূত ব্যাখ্যার কলুষমুক্ত অবস্থায় গ্রহণ

করতে হবে। প্রাকৃত তার্কিকেরা ভগবানের দেওয়া *ভগবদ্গীতার* উপর তাদের পাণ্ডিত্য জাহির করার চেষ্টা করে, কিন্তু তা যথাযথ *ভগবদ্গীতা* নয়। *ভগবদ্গীতার* যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে হয় গুরু-পরম্পরার ধারায় এবং এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান এই জ্ঞান প্রথমে বিবস্বানকে দান করেন। বিবস্বান তা দেন মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে—এভাবেই গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে এই জ্ঞান প্রবাহিত হয়ে আসছে।

শ্লোক ২

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

এবম্—এভাবে; **পরম্পরা**—পরম্পরাক্রমে; **প্রাপ্তম্**—প্রাপ্ত; **ইমম্**—এই বিজ্ঞান; **রাজর্ষয়ঃ**—রাজর্ষিরা; **বিদুঃ**—বিদিত হয়েছিলেন; **সঃ**—সেই জ্ঞান; **কালেন**—কালের প্রভাবে; **ইহ**—এই জগতে; **মহতা**—সুদীর্ঘ; **যোগঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ জ্ঞান সমন্বিত বিজ্ঞান; **নষ্টঃ**—বিনষ্ট; **পরন্তপ**—হে শত্রু দমনকারী অর্জুন।

গীতার গান

সেই পরম্পরা দ্বারা রাজর্ষিগণ ।
একে একে শুনে সব গীতার বচন ॥
কালক্রমে পরম্পরা হয়েছে বিনষ্ট ।
পরম্পরা বিনা জান সব অর্থ ভ্রষ্ট ॥

অনুবাদ

এভাবেই পরম্পরা মাধ্যমে প্রাপ্ত এই পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল এবং তাই সেই যোগ নষ্টপ্রায় হয়েছে।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, *গীতা* রাজর্ষিদের জন্যই বিশেষভাবে উদ্দিষ্ট হয়েছিল, কারণ প্রজাপালনের কাজে তাঁরা যথার্থভাবে এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কার্যকরী করবেন। *ভগবদ্গীতার* অমৃতময় উপদেশ কখনই অসুরদের জন্য নয়। তারা

এই জ্ঞানকে গ্রহণ করতে অক্ষম এবং জনগণের সেবায় প্রয়োগ করতে অক্ষম। পক্ষান্তরে, তারা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো ভগবানের দেওয়া এই দিব্য জ্ঞানের কদর্থ করে। এই সমস্ত মূঢ় দুরাচারীদের কদর্থ সমন্বিত মন্তব্যে *ভগবদ্গীতার* প্রকৃত উদ্দেশ্য যখন ব্যাহত হয়, তখন গুরু-শিষ্যের পরম্পরার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পাঁচ হাজার বছর আগে ভগবান স্বয়ং লক্ষ্য করেন যে, সেই গুরু-শিষ্য পরম্পরার ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাই তিনি ঘোষণা করেন যে, *গীতার* উদ্দেশ্যে হারিয়ে গেছে। আজকের জগতেও আমরা দেখতে পাই, *গীতার* অর্থ কিভাবে বিকৃত হয়ে গেছে—*গীতার* অনেক সংস্করণ আছে (বিশেষ করে ইংরেজী ভাষায়), কিন্তু তাদের মধ্যে প্রায় কোনটাই গুরু-পরম্পরার ধারা অনুযায়ী নয়। তথাকথিত সমস্ত পণ্ডিতেরা *গীতার* অসংখ্য ধরনের ব্যাখ্যা লিখে কৃষ্ণকথার নামে একটি ভাল ব্যবসা জাঁকিয়ে বসেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রায় কেউই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার করে না। এটিই হচ্ছে আসুরিক প্রবৃত্তি। অসুরেরা কখনও ভগবানকে বিশ্বাস করে না, কিন্তু তারা কেবল ভগবানের সম্পত্তি ভোগ করার ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর। পরম্পরার ধারায় প্রাপ্ত *ভগবদ্গীতার* যথাযথ একটি ব্যাখ্যা প্রচার করার বিশেষ প্রয়োজন আছে, তা উপলব্ধি করে এই সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতা* মানুষের প্রতি ভগবানের আশীর্বাদ, মানব-সমাজে এটি এক অমূল্য সম্পদ। এই গ্রন্থটিকে যথাযথভাবে গ্রহণ না করে, দার্শনিক জল্পনা-কল্পনামূলক নিবন্ধ মনে করলে, কেবল সময়েরই অপচয় করা হবে।

শ্লোক ৩

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

সঃ—সেই; **এব**—অবশ্যই; **অয়ম্**—এই; **ময়া**—আমার দ্বারা; **তে**—তোমাকে; **অদ্য**—আজ; **যোগঃ**—যোগ-বিজ্ঞান; **প্রোক্তঃ**—বলা হল; **পুরাতনঃ**—অতি প্রাচীন; **ভক্তঃ**—ভক্ত; **অসি**—তুমি হও; **মে**—আমার; **সখা**—সখা; **চ**—ও; **ইতি**—অতএব; **রহস্যম্**—রহস্য; **হি**—অবশ্যই; **এতৎ**—এই; **উত্তমম্**—উত্তম।

গীতার গান

অতএব কহি পুনঃ সেই পুরাতন ।
পুনর্বার পরম্পরা করিতে স্থাপন ॥

ভক্তি বিনা কে বুঝিবে গীতার রহস্য ।
তুমি মোর প্রিয়সখা করহ বিমুষ্য ॥

অনুবাদ

সেই সনাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বললাম, কারণ তুমি আমার ভক্ত ও সখা এবং তাই তুমি এই বিজ্ঞানের অতি গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

তাৎপর্য

মানব-সমাজে দুই রকমের মানুষ আছে, তারা হচ্ছে ভক্ত ও অসুর। ভগবান অর্জুনকে *ভগবদ্গীতা* দান করতে মনস্থ করেছিলেন, কারণ অর্জুন ছিলেন তাঁর শুদ্ধ ভক্ত। অসুরেরা কখনই এই রহস্যাবৃত জ্ঞানের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে না। এই মহৎ শাস্ত্র *ভগবদ্গীতার* বহু সংস্করণ আছে, তাদের মধ্যে কোনটি ভক্তের মন্তব্য সমন্বিত, আর কোনটি অসুরের মন্তব্য সমন্বিত। ভক্তের মন্তব্য সমন্বিত *ভগবদ্গীতা* পড়লে অনায়াসে *গীতার* যথাযথ অর্থ উপলব্ধি করা যায় এবং তার ফলে ভগবানের মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরে হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। কিন্তু অসুরের মন্তব্য পড়লে কোনই কাজ হয় না, উপরন্তু সর্বনাশ হয়। অর্জুন জানতেন, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান, তাই অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব কারণের কারণ, পরমেশ্বর ভগবান বলে মেনে নিয়ে *ভগবদ্গীতাকে* হৃদয়ঙ্গম করলেই এই পরম বিজ্ঞানের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয়। অসুরেরা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে গ্রহণ করে না। বরং তারা নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করে শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় নির্ধারণ করতে চেষ্টা করে। তারা ভগবানের নানা রকম পরিচয়ও খুঁজে বার করে। এভাবেই তারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে পথভ্রষ্ট করে এবং ভগবৎ-বিদ্বেষী করে তোলে। তাই আমাদের সাবধান হওয়া উচিত, যাতে এই সমস্ত অসুরেরা আমাদের আর অনিষ্ট না করতে পারে। আমাদের উচিত অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে *ভগবদ্গীতার* মর্মার্থ উপলব্ধি করা এবং ভগবানের দেওয়া এই আশীর্বাদকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করে আমাদের মানবজন্ম সার্থক করে তোলা।

শ্লোক ৪

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **অপরম্**—পরবর্তী; **ভবতঃ**—তোমার; **জন্ম**—জন্ম; **পরম্**—পূর্বে; **জন্ম**—জন্ম; **বিবস্বতঃ**—সূর্যদেবের; **কথম্**—কিভাবে; **এতৎ**—এই; **বিজানীয়াম্**—আমি বুঝব; **ত্বম্**—তুমি; **আদৌ**—পুরাকালে; **প্রোক্তবান্**—বলেছিলে; **ইতি**—এভাবে।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

তুমি ত নবীন সখা সেদিন জন্মিলে ।
কোটি কোটি বর্ষ পূর্বে সূর্য জন্ম নিলে ॥
এ কথা কি করে বুঝি পূর্ব এত দিনে ।
উপদেশ পুরাতন তুমি বলেছিলে ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—সূর্যদেব বিবস্বানের জন্ম হয়েছিল তোমার অনেক পূর্বে। তুমি যে পুরাকালে তাঁকে এই জ্ঞান উপদেশ করেছিলে, তা আমি কেমন করে বুঝব?

তাৎপর্য

অর্জুন হচ্ছেন ত্রিভুবন বিশ্রুত ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত; তা হলে এটি কি করে সম্ভব যে, তিনি ভগবানের কথা বিশ্বাস করছেন না? তার কারণ হচ্ছে, অর্জুন এই কথাগুলি তাঁর নিজের জন্য জিজ্ঞাসা করছেন না, কিন্তু যারা ভগবানকে বিশ্বাস করে না অথবা যে সমস্ত অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে মানতে চায় না, তাদের জন্য জিজ্ঞাসা করছেন। দশম অধ্যায়ে প্রমাণিত হবে যে, অর্জুন সব সময়ই জানতেন শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, সব কিছুর উৎস এবং পরম-তত্ত্বের শেষ কথা। সাধারণ মানুষের পক্ষে এটি বুঝতে পারা খুবই কঠিন যে, বসুদেব ও দেবকীর সন্তান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে অনন্ত শক্তির উৎস ও অনাদির আদিপুরুষ ভগবান হতে পারেন। তাই, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন, যাতে তিনি নিজেই তাঁর পরিচয় দান করে সকলের সন্দেহের নিরসন করেন। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান সেই কথা শুধু আজ নয়, পুরাকাল থেকে সমগ্র জগতের সকলেই বিশ্বাস করে আসছে, কিন্তু অসুরেরাই কেবল সেই সত্যকে মানতে চায় না। সে যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সর্বজনগ্রাহ্য প্রামাণ্য উৎস, সেই জন্য অর্জুন

এই প্রশ্নটি তাঁর কাছেই উপস্থাপন করেছিলেন যাতে তিনি নিজেই তার যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারেন, অসুরদের কাছে ব্যাখ্যা শুনতে তিনি চাননি। কারণ, অসুরেরা সব সময়ে তাদের নিজেদের এবং অনুগামীদের বোধগম্য বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়েই শ্রীকৃষ্ণকে বোঝাতে চেয়েছে। প্রত্যেকেরই তার নিজের স্বার্থে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত প্রকৃত তত্ত্ববিজ্ঞান জানা উচিত। তাই, ভগবান যখন নিজেই তাঁর অপ্রাকৃত পরিচয় দান করেন, তখন সমস্ত জগতের মঙ্গল হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া এই তত্ত্বজ্ঞান অসুরদের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হতে পারে, কারণ তারা অনাদি, অনন্ত ভগবৎ-তত্ত্বকে তাদের সীমিত মস্তিষ্কের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করতে চায়; কিন্তু ভগবানের ভক্ত ভগবানের নিজের দেওয়া ভগবৎ-তত্ত্বকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে কৃতার্থ হন। ভক্তবৃন্দ চিরকালই এই পরমতত্ত্ব গ্রহণে আগ্রহী, কারণ তাঁরা সর্বদা ভগবানের অনন্ত লীলা সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। যারা নিরীশ্বরবাদী ভগবৎ-বিদ্বেষী, যারা মনে করে ভগবানও হচ্ছেন একজন সাধারণ মানুষ, তারাও এভাবেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ করে বুঝতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অতি মানবিক, তাঁর রূপ সচ্চিদানন্দময়, তিনি অপ্রাকৃত, তিনি মায়াতীত ও গুণাতীত। ভগবানের ভক্ত মাত্রই অর্জুনের মতো সর্বান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাস করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন সন্দেহ থাকে না। অসুরেরা যে শ্রীকৃষ্ণকে জড়া প্রকৃতির গুণবৈশিষ্ট্যের অধীন একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তাদের সেই অবিশ্বাস জনিত যুক্তি খণ্ডন করার জন্যই অর্জুনের মতো শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবানের কাছে তাঁর ভগবত্তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের মনে ভগবান সম্বন্ধে সন্দেহের কোন রকম অবকাশই থাকে না।

শ্লোক ৫

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন ।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **বহূনি**—বহু; **মে**—আমার; **ব্যতীতানি**—অতীত হয়েছে; **জন্মানি**—জন্ম; **তব**—তোমার; **চ**—এবং; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **তানি**—সেই সমস্ত; **অহম্**—আমি; **বেদ**—জানি; **সর্বাণি**—সমস্ত; **ন**—না; **ত্বম্**—তুমি; **বেত্থ**—জান; **পরন্তপ**—হে শত্রু দমনকারী।

গীতার গান

ভগবান কহিলেন ঃ

হে অর্জুন বহু জন্ম তোমার আমার ।
হয়েছে পূর্বকালে সে সব অপার ॥
ভুলি নাই আমি সেই তুমি ভুলে গেছ ।
আমি বিভু তুমি জীব এইভাবে আছ ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে পরন্তপ অর্জুন! আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হয়েছে। আমি সেই সমস্ত জন্মের কথা স্মরণ করতে পারি, কিন্তু তুমি পার না।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতাতে (৫/৩৩) আমরা ভগবানের নানাবিধ অবতারের সম্বন্ধে জানতে পারি। সেখানে বলা হয়েছে—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি পরম পুরুষোত্তম ভগবান, আদিপুরুষ গোবিন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) ভজনা করি, যিনি অদ্বৈত, অচ্যুত ও অনাদি। যদিও অনন্ত রূপে পরিব্যাপ্ত, তবুও তিনি সকলের আদি, পুরাণ-পুরুষ এবং তিনি সর্বদাই নব-যৌবনসম্পন্ন সুন্দর পুরুষ। যাঁরা শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ, তাঁদের কাছেও ভগবানের সচ্চিদানন্দময় এই রূপ দুর্লভ, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সর্বক্ষণ ভগবানকে এই রূপে দর্শন করেন।"

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৯) আরও বলা হয়েছে—

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু ।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি পরম পুরুষোত্তম ভগবান, আদিপুরুষ গোবিন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) ভজনা করি,

যিনি শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহদেব আদি বহুরূপে অবতরণ করেন, কিন্তু পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁর আদি স্বরূপ এবং তিনি স্বয়ং অবতরণও করেন।"

বেদেও বলা হয়েছে যে, যদিও ভগবান অদ্বৈত, তবুও তিনি অনন্ত রূপে প্রকাশিত হন। বৈদূর্যমণি থেকে যেমন নানা বর্ণ বিচ্ছুরিত হলেও তার নিজের কোন পরিবর্তন হয় না, ভগবানও তেমন নানারূপে প্রকাশিত হলেও তাঁর নিজের কোন পরিবর্তন হয় না। ভগবানের সেই অনন্ত রূপ *বেদ* অধ্যয়নের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁর অনন্ত রূপের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন (*বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ*)। অর্জুনের মতো ভক্তেরা হচ্ছেন ভগবানের নিত্য সহচর। ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তেরাও তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁর সেবা করার জন্য তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ হন। অর্জুন হচ্ছেন সেই রকমই একজন ভক্ত। এই শ্লোকে বোঝা যায়, লক্ষ লক্ষ বছর আগে ভগবান যখন সূর্যদেব বিবস্বানকে *ভগবদ্গীতা* শোনান, তখন অর্জুনও অন্য কোন রূপে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে অর্জুনের পার্থক্য হচ্ছে যে, ভগবান তা ভোলেননি, কিন্তু অর্জুন তা ভুলে গেছেন। বিভুচৈতন্য ভগবানের সঙ্গে অণুচৈতন্য জীবের এটিই পার্থক্য। অর্জুন ছিলেন মহা শক্তিশালী বীর, তিনি ছিলেন পরন্তপ, কিন্তু তা হলেও বহু পূর্ব জন্মের কথা মনে রাখবার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই, ক্ষমতার মাপকাঠিতে জীব যত মহৎই হোক না কেন, সে কখনই ভগবানের সমতুল্য হতে পারে না। যিনি ভগবানের নিত্য সহচর, তিনি অবশ্যই একজন মুক্ত ব্যক্তি, কিন্তু তিনি কখনই ভগবানের সমকক্ষ হতে পারেন না। *ব্রহ্মসংহিতাতে* ভগবানকে অচ্যুত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, জড়-জগতে এলেও ভগবান মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কখনই আত্মবিস্মৃত হন না। তাই, জীব কখনই ভগবান হতে পারে না, এমন কি অর্জুনের মতো মুক্ত জীবও সকল বিষয়ে ভগবানের সমকক্ষ হতে পারেন না। অর্জুন যদিও ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তবুও তিনি মাঝে মাঝে ভগবানের স্বরূপ বিস্মৃত হন, আবার ভগবানের দিব্য কৃপার ফলে ভক্ত মুহূর্তের মধ্যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। কিন্তু অভক্ত বা অসুরেরা কখনই ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ উপলব্ধি করতে পারে না। তারই ফলস্বরূপ *গীতায়* বর্ণিত ভগবানের এই দিব্য তত্ত্বকে আসুরিক বুদ্ধি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর নিত্য সহচর অর্জুন উভয়েই নিত্য শাশ্বত, কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছর আগে ভগবান যে লীলা প্রকট করেন, তা সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের মনে আছে, কিন্তু অর্জুনের মনে নেই। এই শ্লোকের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, জীবের দেহান্তর হবার ফলে তার পূর্ণ বিস্মরণ ঘটে,

কিন্তু ভগবান তাঁর সচ্চিদানন্দময় দেহ পরিবর্তন করেন না, তাই তিনি কিছুই ভোলেন না। তিনি অদ্বৈত অর্থাৎ তাঁর দেহ এবং তিনি স্বয়ং এক ও অভিন্ন। ভগবান সম্পর্কিত সব কিছুই চিন্ময়, কিন্তু জীবের স্বরূপ এবং তার জড় দেহ এক নয়। ভগবান যখন জড় জগতে অবতরণ করেন, তখনও তাঁর দেহ এবং তিনি স্বয়ং একই থাকেন। তাই, জড় জগতে অবতরণ করলেও তিনি জীবের থেকে স্বতন্ত্র থাকেন। ভগবানের এই অপ্রাকৃত তত্ত্ব অসুরেরা কিছুতেই বুঝতে পারে না। সেই কথা ভগবান পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করছেন।

শ্লোক ৬

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

অজঃ—জন্মরহিত; **অপি**—যদিও; **সন্**—হয়েও; **অব্যয়**—অক্ষয়; **আত্মা**—দেহ; **ভূতানাম্**—জীবসমূহের; **ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর; **অপি**—যদিও; **সন্**—হয়ে; **প্রকৃতিম্**—চিন্ময় রূপে; **স্বাম্**—আমার; **অধিষ্ঠায়**—অধিষ্ঠিত হয়ে; **সম্ভবামি**—আবির্ভূত হই; **আত্মমায়য়া**—আমার অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা।

গীতার গান

সকলের নিয়ামক অজন্মা হইয়া ।
অব্যয়াত্মা পরমাত্মা ভুবন ভরিয়া ॥
তথাপি স্বশক্তি সাথে জন্ম লই আমি ।
সেই ভগবত্তা মোর ভাল বুঝ তুমি ॥

অনুবাদ

যদিও আমি জন্মরহিত এবং আমার চিন্ময় দেহ অব্যয় এবং যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তবুও আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে আমি আমার আদি চিন্ময় রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে তাঁর আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন—যদিও তিনি সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হন, তবুও তাঁর বহু বহু পূর্ব 'জন্মের' সমস্ত ঘটনাই

তাঁর মনে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ কয়েক ঘণ্টা পূর্বে কি ঘটেছিল, তা মনে রাখতে পারে না। যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, একদিন আগে ঠিক একই সময়ে সে কি করেছিল, তবে সাধারণ লোকের পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাকে অনেক হিসাব-নিকাশ করে, স্মৃতি রোমন্থন করে, তবে মনে করতে হয় গত দিন ঠিক সেই সময়ে সে কি করেছিল, অথচ তারাই আবার ভগবান হবার দুরাশা পোষণ করে। এই ধরনের অর্থহীন দাবি শুনে কারও বিভ্রান্ত হওয়া ঠিক নয়। ভগবান এখানে তাঁর *প্রকৃতি* বা রূপের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। *প্রকৃতি* বলতে 'স্বভাব' ও 'স্বরূপ' দুই-ই বোঝায়। ভগবান বলছেন, তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে আবির্ভূত হন। সাধারণ জীবদের মতো তিনি এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হন না। বদ্ধ জীবাত্মা এই জন্মে এক রকম দেহ ধারণ করতে পারে, কিন্তু পরবর্তী জন্মে সে ভিন্ন দেহ ধারণ করে। জড় জগতে জীবের দেহ স্থায়ী নয়, প্রকৃতপক্ষে সে প্রতিনিয়তই তার দেহ পরিবর্তন করছে। কিন্তু ভগবানকে দেহ পরিবর্তন করতে হয় না। যখন তিনি জড় জগতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় দেহ নিয়েই আবির্ভূত হন। অর্থাৎ, তিনি যখন এই জড় জগতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর দ্বিভুজ, মুরলীধারী শাশ্বত রূপ নিয়েই আবির্ভূত হন। জড় জগতের কোন কলুষই তাঁর রূপকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু তিনি যদিও তাঁর অপ্রাকৃত রূপ নিয়ে এই জড় জগতে আবির্ভূত হন এবং সর্ব অবস্থাতেই তিনি সমস্ত জগতের অধীশ্বর থাকেন, তবুও তাঁর জন্মলীলা আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই বলে মনে হয়। তাঁর দেহ যদিও পরিবর্তন হয় না, তবুও তিনি শৈশব থেকে পৌগণ্ডে, পৌগণ্ড থেকে কিশোর এবং কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হন, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে যৌবনের ঊর্ধ্বে তাঁর দেহের আর কোন রূপান্তর হয় না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় তাঁর অনেক পৌত্র ছিল, অর্থাৎ জাগতিক হিসাবে তাঁর তখন অনেক বয়স হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হত যেন তিনি কুড়ি-পঁচিশ বছরের যুবক। যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সর্বকালীন আদিপুরুষ—সর্বপ্রাচীন পুরুষ, কিন্তু তাঁকে আমরা কোন অবস্থাতেই বৃদ্ধরূপে দেখি না, কোন ছবিতেও শ্রীকৃষ্ণকে বার্ধক্যগ্রস্ত অবস্থায় দেখা যায় না। কখনও তাঁর দেহের অথবা বুদ্ধির কোন রকম বিকার হয় না। তাই আমরা সহজেই বুঝতে পারি, এই জড় জগতে এসে সাধারণ মানুষের মতো লীলাখেলা করলেও তিনি চিরকালই অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাতন, আদিপুরুষ ও সচ্চিদানন্দময়। বাস্তবিকপক্ষে, তাঁর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান সূর্যের মতো যেন আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন, তারপর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। আকাশে সূর্যকে দেখে যেমন আমরা মনে করি, সূর্য এখন আকাশে রয়েছে, তারপর আমাদের

দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে যেমন আমরা মনে করি সূর্য এখন অস্ত গেছে। প্রকৃতপক্ষে সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে রয়েছে, কিন্তু আমাদের ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে আমরা মনে করি যে, সূর্য উদিত হয় এবং অস্ত যায়। ভগবানও তেমন নিত্য। তাঁর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান সাধারণ মানুষের জন্ম-মৃত্যুর মতো নয়, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর থেকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি, তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে ভগবান সৎ, চিৎ, আনন্দময়—এবং জড়া প্রকৃতির দ্বারা তিনি কখনই কলুষিত হন না। *বেদেও* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান অজ, কিন্তু তবুও মনে হয় তাঁর বহুধা প্রকাশরূপে তিনি যেন সাধারণ মানুষের মতো জন্মগ্রহণ করেছেন। সমস্ত বৈদিক অনুশাস্ত্রাদিতেও অনুমোদন করা হয়েছে যে, ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন জীবের মতো জন্মগ্রহণ করেন বলে মনে হলেও তিনি তাঁর অপ্রাকৃত ও অপরিবর্তনীয় দেহ নিয়েই অবতরণ করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* আছে, কংসের কারাগারে তিনি চতুর্ভুজ ও ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ নারায়ণ রূপ নিয়ে তাঁর মায়ের সামনে আবির্ভূত হন। জীবদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলেই তিনি তাঁর শাশ্বত আদি রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন, যাতে তারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে—নির্বিশেষ রূপের প্রতি নয়, যা নির্বিশেষবাদীরা ভ্রান্তিবশত মনে করে থাকে। *মায়া* অথবা *আত্মমায়া* হচ্ছে ভগবানের সেই অহৈতুকী কৃপা—*বিশ্বকোষ* অভিধানে তাই বলা হয়েছে। ভগবান তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত অবতরণের এবং অন্তর্ধানের ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে রাখেন। কিন্তু সাধারণ জীব অন্য একটি দেহ পাওয়া মাত্রই তার পূর্ব জন্মের সমস্ত কথা ভুলে যায়। ভগবান সমস্ত জীবের ঈশ্বর, কারণ এই জগতে অবস্থান করার সময় তিনি বিস্ময়কর ও অতিমানবীয় অসীম শৌর্যবীর্যের লীলা প্রদর্শন করেন। তাই, ভগবান সব সময়ই পরমতত্ত্ব। তাঁর নাম ও রূপের মধ্যে, গুণ ও লীলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ভগবান কেন এই জড় জগতে আবির্ভূত হন এবং আবার অন্তর্হিত হয়ে যান। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ৭

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

যদা যদা—যখন ও যেখানে; **হি**—অবশ্যই; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **গ্লানিঃ**—হানি; **ভবতি**—হয়; **ভারত**—হে ভরতবংশীয়; **অভ্যুত্থানম্**—উত্থান; **অধর্মস্য**—অধর্মের; **তদা**—তখন; **আত্মানম্**—নিজেকে; **সৃজামি**—প্রকাশ করি; **অহম্**—আমি।

গীতার গান

যদা যদা ধর্মগ্লানি হইল সংসারে ।
হে ভারত! বিশ্বভার লঘু করিবারে ॥
অধর্মের অভ্যুত্থান ধর্মগ্লানি হলে ।
আত্মার সৃজন করি দেখয়ে সকলে ॥

অনুবাদ

হে ভারত! যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।

তাৎপর্য

এখানে *সৃজামি* কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই *সৃজামি* কথাটি সৃষ্টি করার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কারণ, পূর্ববর্তী শ্লোক অনুযায়ী, ভগবানের সমস্ত রূপই নিত্য বিরাজমান, তাই ভগবানের রূপ বা শরীর কখনও সৃষ্টি হয় না। সুতরাং, *সৃজামি* মানে—ভগবানের যা স্বরূপ, সেভাবেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। যদিও ব্রহ্মার একদিনে, সপ্তম মনুর অষ্ট-বিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে ভগবান তাঁর স্বরূপে আবির্ভূত হন, কিন্তু প্রকৃতির কোন নিয়মকানুনের বন্ধনে তিনি আবদ্ধ নন। তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে লীলা করেন—তিনি হচ্ছেন *স্বরাট্* । তাই, যখন অধর্মের অভ্যুত্থান এবং ধর্মের গ্লানি হয়, তখন ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এই জড় জগতে অবতরণ করেন। ধর্মের তত্ত্ব *বেদে* নির্দেশিত হয়েছে এবং *বেদের* এই নির্দেশগুলির যথাযথ আচার না করাটাই হচ্ছে অধর্ম। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে, এই সমস্ত নির্দেশগুলি হচ্ছে ভগবানের আইন এবং ভগবান নিজেই কেবল ধর্মের সৃষ্টি করতে পারেন। *বেদ* ভগবানেরই বাণী এবং ব্রহ্মার হৃদয়ে তিনি এই জ্ঞান সঞ্চার করেন। তাই ধর্মের বিধান হচ্ছে সরাসরিভাবে ভগবানের আদেশ (*ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্*)। *ভগবদ্গীতার* সর্বত্রই এই তত্ত্বের বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের নির্দেশে এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে *বেদের* উদ্দেশ্য। *গীতার* শেষে ভগবান স্পষ্টভাবেই বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—সর্ব ধর্ম ত্যাগি লও আমার শরণ। বৈদিক নির্দেশগুলি মানুষকে ভগবানের প্রতি পূর্ণ শরণাগত হতে সাহায্য করে। যখনই অসুরেরা অথবা আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা তাতে বাধার সৃষ্টি করে, তখন ভগবান আবির্ভূত হন। *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে

আমরা জানতে পারি, যখন জড়বাদে পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছিল এবং জড়বাদীরা *বেদের* নাম করে যথেচ্ছাচার করছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণের অবতার বুদ্ধদেব অবতরণ করেছিলেন। *বেদে* কোন কোন বিশেষ অবস্থায় পশুবলি দেবার বিধান আছে, কিন্তু আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসরণ না করে নিজেদের ইচ্ছামতো পশুবলি দিতে শুরু করে। এই অনাচার দূর করে *বেদের* অহিংস নীতির প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভগবান বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছিলেন। এভাবেই আমরা দেখতে পাই, ভগবানের সমস্ত অবতার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য এই জড় জগতে অবতরণ করেন এবং শাস্ত্রে তার উল্লেখ থাকে। শাস্ত্রের প্রমাণ না থাকলে কাউকে অবতার বলে গ্রহণ করা উচিত নয়। অনেকে আবার মনে করেন, ভগবান কেবল ভারত-ভূমিতেই অবতরণ করেন, কিন্তু এই ধারণাটি ভুল। তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোন জায়গায়, যে কোন অবস্থায়, যে কোন রূপে অবতরণ করতে পারেন। প্রত্যেক অবতরণে তিনি ধর্ম সম্বন্ধে ততটুকুই ব্যাখ্যা করেন, যতটুকু সেই বিশেষ স্থান ও কালের মানুষেরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য একই থাকে—ধর্ম সংস্থাপন করা এবং মানুষকে ভগবন্মুখী করা। কখনও তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হন, কখনও তিনি তাঁর সন্তান অথবা ভৃত্যরূপে তাঁর প্রতিনিধিকে প্রেরণ করেন, আবার কখনও তিনি ছদ্মবেশে অবতরণ করেন।

অর্জুনের মতো মহাভাগবতকে ভগবান *ভগবদ্গীতা* শুনিয়েছিলেন, কারণ *ভগবদ্গীতার* মর্মার্থ উন্নত বুদ্ধি-মত্তাসম্পন্ন মানুষেরাই কেবল বুঝতে পারে। দুই আর দুইয়ে চার হয়। এই আঙ্কিক তত্ত্ব একটি শিশুর কাছেও সত্য আবার একজন মহাপণ্ডিত গণিতজ্ঞের কাছেও সত্য, কিন্তু তবুও গণিতের স্তরভেদ আছে। প্রতিটি অবতারে ভগবান একই তত্ত্বজ্ঞান দান করেন, কিন্তু স্থান-কাল বিশেষে তাদের উচ্চ ও নিম্ন মানসম্পন্ন বলে মনে হয়। উচ্চ মানের ধর্ম অনুশীলন শুরু হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম সমন্বিত সমাজ-ব্যবস্থার মাধ্যমে। ভগবানের অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বত্র সকলকে কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা। কেবলমাত্র অবস্থাভেদে সময়-সময় এই ভাবনার প্রকাশ ও অপ্রকাশ হয়।

শ্লোক ৮

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

পরিত্রাণায়—পরিত্রাণ করার জন্য; **সাধূনাম্**—ভক্তদের; **বিনাশায়**—বিনাশ করার জন্য; **চ**—এবং; **দুষ্কৃতাম্**—দুষ্কৃতকারীদের; **ধর্ম**—ধর্ম; **সংস্থাপনার্থায়**—সংস্থাপনের জন্য; **সম্ভবামি**—অবতীর্ণ হই; **যুগে যুগে**—যুগে যুগে।

গীতার গান

সাধুদের পরিত্রাণ অসাধুর বিনাশ ।
যে করে অধর্ম তার করি সর্বনাশ ॥
আর ধর্ম স্থিতি অর্থ করিতে সাধন ।
যুগে যুগে আসি আমি মান সে বচন ॥

অনুবাদ

সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতা অনুসারে কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ যে মানুষ, তিনি হচ্ছেন সাধু। কোন লোককে আপাতদৃষ্টিতে অধার্মিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর অন্তরে তিনি যদি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তবে বুঝতে হবে তিনি সাধু। আর যারা কৃষ্ণভাবনাকে গ্রাহ্য করে না, তাদের উদ্দেশ্যে *দুষ্কৃতাম্* শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। এই সমস্ত অসাধু বা দুষ্কৃতকারীরা লৌকিক বিদ্যায় অলঙ্কৃত হলেও এদের মূঢ় ও নরাধম বলা হয়। কিন্তু যিনি চব্বিশ ঘণ্টায় ভগবদ্ভক্তিতে নিয়োজিত, তিনি যদি মূর্খ এবং অসভ্যও হন, তবুও বুঝতে হবে যে তিনি সাধু। রাবণ, কংস আদি অসুরদের নিধন করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান যেমনভাবে অবতরণ করেছিলেন, নিরীশ্বরবাদীদের বিনাশ করবার জন্য তাঁকে তেমনভাবে অবতরণ করতে হয় না। ভগবানের অনেক অনুচর আছেন, যাঁরা অনায়াসে অসুরদের সংহার করতে পারেন। কিন্তু ভগবানের অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর ভক্তদের শান্তিবিধান করা। অসুরেরা ভগবানের ভক্তদের নানাভাবে কষ্ট দেয়, তাঁদের উপর উৎপাত করে, তাই তাঁদের পরিত্রাণ করবার জন্য ভগবান অবতরণ করেন। অসুরের স্বভাবই হচ্ছে ভক্তদের উপর অত্যাচার করা, ভক্ত যদি তার পরমাত্মীয়ও হয়, তবুও সে রেহাই পায় না। প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন হিরণ্যকশিপুর সন্তান, কিন্তু তা সত্ত্বেও হিরণ্যকশিপু তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করে। শ্রীকৃষ্ণের মাতা দেবকী ছিলেন কংসের ভগিনী,

কিন্তু তা সত্ত্বেও কংস তাঁকে এবং তাঁর পতি বসুদেবকে নানাভাবে নির্যাতিত করে, কারণ সে জানতে পেরেছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সন্তানরূপে আবির্ভূত হবেন। এর থেকে বোঝা যায়, কংসকে নিধন করাটা শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেবকীকে উদ্ধার করা। কিন্তু এই দুটি কাজই একসঙ্গে সাধিত হয়েছিল। তাই ভগবান এখানে বলেছেন, সাধুদের পরিত্রাণ আর অসাধুর বিনাশ করবার জন্য তিনি অবতরণ করেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিম্নলিখিত (*মধ্য* ২০/২৬৩-২৬৪) শ্লোকগুলির মাধ্যমে ভগবানের অবতরণের মূলতত্ত্ব সংক্ষেপে উপস্থাপনা করেছেন—

সৃষ্টি-হেতু যেই মূর্তি প্রপঞ্চে অবতরে ।
সেই ঈশ্বরমূর্তি 'অবতার' নাম ধরে ॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান ।
বিশ্বে অবতরি' ধরে 'অবতার' নাম ॥

"ভগবৎ-ধাম থেকে এই জড় জগতে প্রকট হবার ফলে ঈশ্বরমূর্তি অবতার নাম ধরে। এই অবতারেরা অপ্রাকৃত পরব্যোমে অবস্থান করেন। প্রাকৃত জগতে অবতরণ করার জন্য তাঁকে অবতার বলা হয়।"

ভগবানের অনেক রকম অবতার আছে, যেমন—পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, শক্ত্যাবেশ অবতার, মন্বন্তর অবতার ও যুগাবতার। তাঁরা নির্ধারিত সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের উৎস—আদিপুরুষ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের আর্তিহরণ এবং পরিতোষণ করবার জন্য, যাঁরা তাঁর শাশ্বত সনাতন শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় তাঁকে দর্শন করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন। তাই, শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের পরিতোষণ করা।

ভগবান এখানে বলেছেন, তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এর থেকে বোঝা যায়, তিনি কলিযুগেও অবতরণ করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে*ও বলা হয়েছে, কলিযুগের অবতার গৌরসুন্দর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করবেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করবেন। তিনি ভবিষ্যৎ-বাণী করে গেছেন—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম ।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতরণের কথা *উপনিষদ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত* আদি শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশে গুপ্তভাবে উল্লেখ আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ নেই। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত সংকীর্তন যজ্ঞের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। ভগবানের এই অবতার দুষ্কৃতকারীদের সংহার করেন না, বরং তিনি তাঁর অহৈতুকী কৃপায় ভবসাগর থেকে তাদের উদ্ধার করেন।

শ্লোক ৯

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৯ ॥

জন্ম—জন্ম; **কর্ম**—কর্ম; **চ**—এবং; **মে**—আমার; **দিব্যম্**—দিব্য; **এবম্**—এভাবে; **যঃ**—যিনি; **বেত্তি**—জানেন; **তত্ত্বতঃ**—যথার্থভাবে; **ত্যক্ত্বা**—ত্যাগ করে; **দেহম্**—বর্তমান দেহ; **পুনঃ**—পুনরায়; **জন্ম**—জন্ম; **ন**—না; **এতি**—প্রাপ্ত হন; **মাম্**—আমাকে; **এতি**—প্রাপ্ত হন; **সঃ**—তিনি; **অর্জুন**—হে অর্জুন।

গীতার গান

আমার যে জন্মকর্ম সে অতি মহান ।
যে বুঝিল সেই কথা সেও ভাগ্যবান ॥
সে ছাড়িয়া দেহ এই নহে পুনর্জন্ম ।
মম ধামে ফিরি আসে ছাড়ে জড় ধর্ম ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম ও কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।

তাৎপর্য

পরব্যোম থেকে ভগবানের অবতরণের কথা ষষ্ঠ শ্লোকে ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যিনি ভগবানের অবতরণের তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়েছেন এবং তাই দেহত্যাগ করার পর তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবৎ-ধামে ফিরে যান। জড় বন্ধন থেকে এভাবে মুক্ত হওয়া

মোটেই সহজসাধ্য নয়। নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী ও যোগীরা বহু জন্ম-জন্মান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে এই মুক্তি লাভ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হয়ে গিয়ে তারা যে মুক্তি লাভ করে, তা পূর্ণ মুক্তি নয়, তাদের পুনরায় এই জড় জগতে পতিত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত, ভগবানের সচ্চিদানন্দময় দেহ ও তাঁর লীলার অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করতে পেরে দেহত্যাগ করার পরে ভগবানের ধামে গমন করেন এবং তখন আর তাঁর জড় জগতে অধঃপতিত হবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৩) বলা হয়েছে, ভগবানের রূপ অনন্ত, ভগবানের অবতার অনন্ত—*অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*। ভগবানের রূপ অনন্ত হলেও তিনি এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবান। এই সত্যকে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বুঝতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত জড় জ্ঞানী ও পণ্ডিতেরা এই পরম সত্যকে বিশ্বাস করতে পারে না। *বেদে* (*পুরুষবোধিনী উপনিষদে*) বলা হয়েছে—

একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী হৃদ্যন্তরাত্মা ।

"এক ও অদ্বিতীয় ভগবান নানা দিব্যরূপে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে লীলা করতে নিত্য অনুরক্ত।" *বেদের* এই উক্তিকে ভগবান নিজেই *গীতার* এই শ্লোকে প্রমাণিত করেছেন। যিনি সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে *বেদের* এই কথাকে, ভগবানের এই কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে কালক্ষয় করেন না, তিনি সর্বোচ্চ স্তরের মুক্তি লাভ করেন। *বেদের তত্ত্বমসি* কথাটির যথার্থ তাৎপর্য এই সন্দর্ভে আছে। যিনি বুঝতে পেরেছেন, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর অথবা যিনি ভগবানকে বলতে পারেন, "তুমিই পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, স্বয়ং ভগবান"—তাঁর তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ হয় এবং ভগবানের নিত্য ধামে তিনি নিশ্চিতভাবে ভগবানের চিন্ময় সাহচর্য লাভ করেন। অর্থাৎ, ভগবানের এই রকম একনিষ্ঠ ভক্তই যে পরমার্থ লাভ করেন, সেই সম্বন্ধে বৈদিক উক্তির মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয়েছে—

তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ।

"পরমেশ্বর ভগবানকে জানবার ফলেই জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এ ছাড়া আর কোনই পথ নেই।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৩/৮) কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে জানে না, সে তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই তার পক্ষে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। মধুর বোতল চাটলেই যেমন মধুর স্বাদ লাভ করা যায় না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে না জেনে *ভগবদ্গীতা* পাঠ করলে এবং তার মনগড়া ব্যাখ্যা করলেও তেমন কোন কাজ হয় না। এই সমস্ত দার্শনিকেরা জড় জগতে অনেক সম্মান, অনেক প্রতিপত্তি, অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারে, কিন্তু

তারা ভগবানের কৃপা লাভ করে মুক্তি লাভের যোগ্য নয়। ভগবদ্ভক্তের অহৈতুকী কৃপা লাভ না করা পর্যন্ত অহঙ্কারে মত্ত এই সমস্ত পণ্ডিতেরা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। তাই মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য হচ্ছে সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞান সহকারে কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন করে পরমার্থ সাধন করা।

শ্লোক ১০

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

বীত—মুক্ত; **রাগ**—আসক্তি; **ভয়**—ভয়; **ক্রোধাঃ**—ক্রোধ; **মন্ময়া**—আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত; **মাম্**—আমার; **উপাশ্রিতাঃ**—একান্তভাবে আশ্রিত হয়ে; **বহবঃ**—বহু; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **পূতাঃ**—পবিত্র হয়ে; **মদ্ভাবম্**—আমার প্রতি অপ্রাকৃত প্রেম; **আগতাঃ**—লাভ করেছে।

গীতার গান

ছাড়ি রাগ ভয় ক্রোধ ত্রিবিধ অসার ।
মন্ময় মদ্ভক্তি সাধ্য করিয়া বিচার ॥
বহু ভক্ত জ্ঞানী সব তপস্যার দ্বারে ।
বিধৌত হইয়া পাপ পেয়েছে আমারে ॥

অনুবাদ

আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে, সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন হয়ে, একান্তভাবে আমার আশ্রিত হয়ে, পূর্বে বহু বহু ব্যক্তি আমার জ্ঞান লাভ করে পবিত্র হয়েছে—এবং এভাবেই সকলেই আমার অপ্রাকৃত প্রীতি লাভ করেছে।

তাৎপর্য

আগেই বলা হয়েছে, যে সমস্ত মানুষ জড়ের প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত, তাদের পক্ষে পরম-তত্ত্বের সবিশেষ রূপ উপলব্ধি করা দুষ্কর। সাধারণত, যে সমস্ত মানুষ দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত, তারা জড় বস্তুবাদ চিন্তায় এমনই মগ্ন যে, তাদের পক্ষে ভগবানের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব। এই সমস্ত জড়বাদীরা কোনমতেই বুঝে উঠতে পারে না যে, ভগবানের একটি

চিন্ময় দেহ আছে, যা অবিনশ্বর, পূর্ণ জ্ঞানময় এবং নিত্য আনন্দময়। জড়বাদী চিন্তাধারায়, আমাদের জড় দেহটি নশ্বর, অজ্ঞানতার দ্বারা আচ্ছন্ন এবং সম্পূর্ণ নিরানন্দ। সুতরাং, এই জড় দেহটিকেই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বলে মেনে নিয়ে আমরা মনে করি, ভগবানের দেহটিও তেমন নশ্বর, অজ্ঞান এবং সম্পূর্ণ নিরানন্দ। সুতরাং, সাধারণ মানুষকে যখন ভগবানের ব্যক্তিগত স্বরূপ সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তখন তারা জড় দেহগত ধারণাই মনে ভাবতে থাকে। এই জড় দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেহসর্বস্ব মানুষ মনে করে, বিশ্বচরাচরের যে বিরাটরূপ সেটিই পরমতত্ত্ব। তার ফলে তারা মনে করে, পরমেশ্বরের কোন আকার নেই—তিনি নির্বিশেষ। আর তারা এতই গভীরভাবে বিষয়াসক্ত যে, জড় জগৎ থেকে মুক্ত হবার পরেও যে একটি অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব আছে, তা তারা মানতে ভয় পায়। যখন তারা অবহিত হয় যে, চিন্ময় জীবনও হচ্ছে স্বতন্ত্র ও সবিশেষ, তখন তারা পুনরায় ব্যক্তি হবার ভয়ে ভীত হয় এবং তাই নিরাকার, নির্বিশেষ শূন্যে বিলীন হতে পারলেই পরম প্রাপ্তি বলে তারা মনে করে। সাধারণত তারা জীবাত্মাকে সমুদ্রের বুদ্বুদের সঙ্গে তুলনা করে, যা সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়ে সমুদ্রের মধ্যেই আবার বিলীন হয়ে যায়। তাদের মতে এটিই হচ্ছে পৃথক ব্যক্তিসত্তা রহিত চিন্ময় অস্তিত্বের চরম সিদ্ধি। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে যথার্থ আত্মজ্ঞানশূন্য জীবনের এক ভয়ংকর অবস্থা। এ ছাড়া আর এক দল লোক আছে যারা অপ্রাকৃত অস্তিত্বের কথা একেবারেই বুঝতে পারে না। মানুষের কল্পনাপ্রসূত নানা রকম দার্শনিক মতবাদ এবং তাদের মতভেদের ফলে বিভ্রান্ত হয়ে তারা এতই বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে যে, শেষকালে তারা মূর্খের মতো সিদ্ধান্ত নেয়, ভগবান নেই এবং এক সময় সব কিছুই শূন্যে পর্যবসিত হবে। এই ধরনের লোকেরা বিকারগ্রস্ত রুগ্ন জীবন যাপন করে। আর এক ধরনের লোক আছে, যারা জড় বিষয়ে এতই আসক্ত যে, পারমার্থিক তত্ত্ব নিয়ে তারা একেবারেই মাথা ঘামায় না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরম চিন্ময় কারণে লীন হতে চায় এবং কেউ কেউ আবার মনগড়া দার্শনিক তত্ত্বের কোন কূল-কিনারা না পেয়ে, নিরাশ হয়ে সব কিছুকেই অবিশ্বাস করে। এই ধরনের মানুষেরা গাঁজা, চরস, ভাঙ আদি মাদকদ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাদের সেই নেশাগ্রস্ত বিকৃত মনের অলীক কল্পনাকে দিব্য দর্শন বলে প্রচার করে ধর্মভীরু কিছু মানুষকে প্রতারিত করে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, পারমার্থিক কর্তব্যে অবহেলা করা, ভগবানের অপ্রাকৃত স্বরূপকে আমাদের জড় রূপের মতো বলে মনে করে ভীত হওয়া এবং জড় জীবনের নৈরাশ্যের ফলে সব কিছুকে শূন্য বলে মনে করা—জড় জগতের এই তিনটি আসক্তির স্তর থেকে মুক্ত হওয়া। জড়

জীবনের এই তিনটি বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে—সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করে ভগবানের সেবা করা, বিধি অনুসারে ভক্তিযোগের অনুশীলন করা। ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরকে বলা হয় 'ভাব' অর্থাৎ ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমের অনুভূতি।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রণীত ভক্তিবিজ্ঞান *শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (১/৪/১৫-১৬) বলা হয়েছে—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া ।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি ।
সাধকানাময়ং প্রেম্‌ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

"প্রথমে অবশ্যই আত্ম-উপলব্ধি লাভের প্রতি প্রারম্ভিক আগ্রহ জাগাতে হবে। এই থেকে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত সাধু ব্যক্তিদের সঙ্গ লাভের বাসনা জন্মাবে। পরবর্তী স্তরে কোনও ভগবৎ-জ্ঞানী সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে নবদীক্ষিত ভক্ত সাধনভক্তির পদ্ধতি অনুশীলন করতে শুরু করবেন। সদ্‌গুরুর অধীনে এভাবেই ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার ফলে, মানুষ জড় বন্ধনের আসক্তি থেকে মুক্তি লাভ করে, আত্ম-উপলব্ধির পথে অবাধ গতি লাভ করে এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় রুচি অর্জন করে। এই রুচি অর্জনের ফলে মানুষ কৃষ্ণভাবনার প্রতি আরও আসক্তি লাভ করে—যা থেকে ভগবানের প্রতি পারমার্থিক প্রেমভক্তির প্রারম্ভিক স্তর 'ভাব' পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায়। ভগবানের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার নাম প্রেম। এই প্রেম হচ্ছে জীবনের চরম সার্থকতার পরিণতি।" এই প্রেমভক্তির স্তরে ভক্ত নিরন্তর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময় সেবায় নিয়োজিত থাকে। সুতরাং সদ্‌গুরুর পথনির্দেশ অনুসারে ধীরে ধীরে ভগবৎ-সেবার পদ্ধতি অনুসরণ করতে করতে মানুষ আত্মোন্নতির সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে পারে। সে তখন জড় বন্ধনের সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্তি লাভ করে, তার নিজের পৃথক চিন্ময় ব্যক্তিসত্তার আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয় এবং শূন্যবাদী জীবনদর্শন চিন্তার ফলে সৃষ্ট হতাশাবোধ থেকে নিষ্কৃতি পায়। তখন সে পরমেশ্বর ভগবানের ধামে অবশেষে পৌঁছতে পারে।

শ্লোক ১১

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১ ॥

যে—যারা; **যথা**—যেভাবে; **মাম্**—আমাকে; **প্রপদ্যন্তে**—আত্মসমর্পণ করে; **তান্**—তাদের; **তথা**—সেভাবে; **এব**—অবশ্যই; **ভজামি**—পুরস্কৃত করি; **অহম্**—আমি; **মম**—আমার; **বর্ত্ম**—পথ; **অনুবর্তন্তে**—অনুসরণ করে; **মনুষ্যাঃ**—সমস্ত মানুষ; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **সর্বশঃ**—সর্বতোভাবে।

গীতার গান

যেভাবে যে ভজে মোরে আমি সেই ভাবে ।
যথাযোগ্য ফল দিই আপন প্রভাবে ॥
আমাকেই সর্ব মতে চাহে সব ঠাঁই ।
আগুপিছু মাত্র হয় পথে ভেদ নাই ॥

অনুবাদ

যারা যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, আমি তাদেরকে সেভাবেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ! সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথ অনুসরণ করে।

তাৎপর্য

সকলেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি রূপে এবং অণু-পরমাণু সহ সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মারূপে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরাই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারেন। সমস্ত তত্ত্ব অনুসন্ধানী সাধকের সাধনার বস্তু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তবে যে যেভাবে ভগবানকে পেতে চায়, তার সিদ্ধিও হয় তেমনভাবে। অপ্রাকৃত জগতেও ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের ভাবনা অনুযায়ী তাঁদের সঙ্গে ভাবের বিনিময় করে থাকেন। সেখানে কেউ শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর জ্ঞানে সেবা করে, কেউ তাঁকে সখা বলে মনে করে খেলা করে, কেউ সন্তান বলে মনে করে স্নেহ করে, আবার কেউ পরম প্রিয় বলে মনে করে ভালবাসে। ভগবানও তেমন তাঁদের বাসনা অনুযায়ী তাঁদের সকলের সঙ্গে লীলাখেলা করে তাঁদের ভালবাসার প্রতিদান দেন। জড় জগতেও তেমন, বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে ভজনা করে এবং ভগবানও তাদের ভাবনা অনুযায়ী তাদের সঙ্গে ভাবের বিনিময় করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা অপ্রাকৃত জগতে এবং এই জড় জগতে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁর সেবায় নিয়োজিত হয়ে অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভব করেন। যে সমস্ত নির্বিশেষবাদী তাদের আত্মার সত্তাকে বিনাশ করে দিয়ে

আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা করতে চায়, শ্রীকৃষ্ণ তাদের তাঁর ব্রহ্মজ্যোতিতে আত্মসাৎ করে নেন। এই সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের সচ্চিদানন্দময় রূপ বিশ্বাস করে না; তাই তারা ভগবানের সান্নিধ্য লাভের আনন্দও উপলব্ধি করতে পারে না এবং পরিণামে তাদের ব্যক্তিগত সত্তার অনুভূতিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ব্রহ্মেও বিলীন হয়ে যেতে পারে না, তারা এই জড় জগতে ফিরে এসে তাদের সুপ্ত ভোগবাসনা চরিতার্থ করে। তারা অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ করার অনুমতি পায় না, কিন্তু এই জগতে এসে আবার পবিত্র হবার সুযোগ পায়। যারা সকাম কর্মী, যজ্ঞেশ্বররূপে ভগবান তাদের যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফল প্রদান করেন এবং যে সমস্ত যোগী সিদ্ধি কামনা করে, তিনি তাদের সেই ক্ষমতা প্রদান করেন। এভাবেই আমরা দেখতে পাই, সকলের সাধনার সিদ্ধি লাভ হয় ভগবানেরই করুণার ফলে এবং পরমার্থ সাধনের বিভিন্ন পন্থাগুলি হচ্ছে সেই একই মার্গের বিভিন্ন স্তর। তাই, কৃষ্ণভাবনার চরম সিদ্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে সমস্ত প্রচেষ্টাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৩/১০) এই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"সব রকম কামনা-রহিত ভক্তই হোক, সব রকম কামনা-বিশিষ্ট যাজ্ঞিকই হোক, বা মোক্ষকামী যোগীই হোক না কেন, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করা।

শ্লোক ১২

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২ ॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ—কামনা করে; **কর্মণাম্**—সকাম কর্মসমূহের; **সিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **যজন্তে**—যজ্ঞের দ্বারা উপাসনা করে; **ইহ**—এই; **দেবতাঃ**—দেবতাদের; **ক্ষিপ্রম্**—অতি শীঘ্র; **হি**—অবশ্যই; **মানুষে**—মানব-সমাজে; **লোকে**—জড় জগতে; **সিদ্ধিঃ**—ফল লাভ; **ভবতি**—হয়; **কর্মজা**—সকাম কর্ম থেকে।

গীতার গান

কর্মকাণ্ডী সিদ্ধি লাগি বহু দেবদেবী ।
ইহলোক হয় সব বহু সেব্য সেবী ॥

শীঘ্র যেই কর্মফল এ মনুষ্যলোকে ।
অনিত্য সে ফল ভুঞ্জে দুঃখে আর শোকে ॥

অনুবাদ

এই জগতে মানুষেরা সকাম কর্মের সিদ্ধি কামনা করে এবং তাই তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করে। সকাম কর্মের ফল অবশ্যই অতি শীঘ্রই লাভ হয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের দেব-দেবীদের সম্বন্ধে বিষয়াসক্ত লোকদের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে। অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন বেশ কিছু লোক, যারা নিজেদের মহাপণ্ডিত বলে লোক ঠকায়, তারা এই সমস্ত দেব-দেবীকে ভগবানের বিভিন্ন রূপ বলে মনে করে এবং তাদের ভ্রান্ত প্রচারের ফলে জনসাধারণও সেই কথা সত্য বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত দেব-দেবী ভগবানের বিভিন্ন রূপ নন, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন অংশ-বিশেষ। ভগবান হচ্ছেন এক আর অবিচ্ছেদ্য অংশেরা হচ্ছে বহু। *বেদে* বলা হয়েছে, *নিত্যো নিত্যানাম্*—ভগবান হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয়। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ*—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর।" বিভিন্ন দেব-দেবী হচ্ছেন শক্তিপ্রাপ্ত যাতে তাঁরা এই জড় জগৎকে পরিচালনা করতে পারেন। এই সমস্ত দেব-দেবীও হচ্ছেন জড় জগতের বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন জীব (*নিত্যানাম্*), তাই তাঁরা কোন অবস্থাতেই ভগবানের সমকক্ষ হতে পারেন না। যে মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীনারায়ণ ও বিভিন্ন দেব-দেবী একই পর্যায়ভুক্ত, তার কোন রকম শাস্ত্রজ্ঞান নেই, তাকে বলা হয় নাস্তিক অথবা পাষণ্ডী। এমন কি দেবাদিদেব মহাদেব এবং আদি পিতামহ ব্রহ্মাকেও ভগবানের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। প্রকৃতপক্ষে শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতারা নিরন্তর ভগবানের সেবা করেন (*শিববিরিঞ্চিনুতম্*)। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানব-সমাজে অনেক নেতা আছে, যাদেরকে মূর্খ লোকেরা 'ভগবানে নরত্ব আরোপ', এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অবতার জ্ঞানে পূজা করে। *ইহ দেবতাঃ* বলতে এই জড় জগতের কোন শক্তিশালী মানুষকে অথবা দেবতাকে বোঝায়। কিন্তু ভগবান শ্রীনারায়ণ, শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর, তিনি এই জড় জগতের তত্ত্ব নন। তিনি জড় জগতের অতীত চিন্ময় জগতে অবস্থান করেন। এমন কি মায়াবাদ দর্শনের প্রণেতা শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বলে গেছেন, নারায়ণ অথবা শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতের অতীত। কিন্তু মূর্খ লোকেরা (*হৃতজ্ঞান*) তা সত্ত্বেও তাৎকালিক ফল লাভ করার আশায় বিভিন্ন জড়

দেব-দেবীর পূজা করে চলে। এই সমস্ত মূর্খ লোকগুলি বুঝতে পারে না, বিভিন্ন দেব-দেবীকে পূজা করার ফলে যে ফল লাভ হয়, তা অনিত্য। যিনি প্রকৃত বুদ্ধিমান, তিনি ভগবানেরই সেবা করেন। তুচ্ছ ও অনিত্য লাভের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীকে পূজা করা নিষ্প্রয়োজন। জড়া প্রকৃতির বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত দেব-দেবী এবং তাঁদের উপাসকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। দেব-দেবীদের দেওয়া বরও হচ্ছে জড় এবং অনিত্য। জড় জগৎ, জড় জগতের বাসিন্দা, এমন কি বিভিন্ন দেব-দেবী এবং তাঁদের উপাসকেরা সকলেই হচ্ছে মহাজাগতিক সমুদ্রের বুদ্বুদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই জগতের মানব-সমাজ ভূসম্পত্তি, পরিবার-পরিজন, ভোগের সামগ্রী আদি অনিত্য জড় ঐশ্বর্য লাভের আশায় উন্মাদ। এই প্রকার অনিত্য বস্তু লাভের জন্য মানুষেরা মানব-সমাজে বিভিন্ন দেব-দেবীর অথবা শক্তিশালী কোন ব্যক্তির পূজা করে। কোন রাজনৈতিক নেতাকে পূজা করে যদি ক্ষমতা লাভ করা যায়, সেটিকে তারা পরম প্রাপ্তি বলে মনে করে। তাই তারা সকলেই তথাকথিত নেতাদের দণ্ডবৎ প্রণাম করছে এবং তার ফলে তাদের কাছ থেকে ছোটখাটো কিছু আশীর্বাদও লাভ করছে। এই সমস্ত মূর্খ লোকেরা জড় জগতের দুঃখকষ্ট থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হবার জন্য ভগবানের শরণাগত হতে আগ্রহী নয়। পক্ষান্তরে, সকলেই তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার জন্য ব্যস্ত এবং তুচ্ছ একটু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার জন্য এরা দেব-দেবী নামক বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত জীবদের আরাধনার প্রতি আকর্ষিত হয়। এই শ্লোক থেকে বোঝা যায়, খুব কম মানুষই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের শরণাগত হয়। অধিকাংশ মানুষই সর্বক্ষণ চিন্তা করছে কিভাবে আরও একটু বেশি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা যায়। আর এই সমস্ত ভোগবাসনা চরিতার্থ করবার জন্য তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে 'এটি দাও' 'ওটি দাও' বলে কাঙ্গালপনা করে তাদের সময় নষ্ট করছে।

শ্লোক ১৩

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

চাতুর্বর্ণ্যম্—মানব-সমাজের চারিটি বিভাগ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট হয়েছে; **গুণ**—গুণ; **কর্ম**—কর্ম; **বিভাগশঃ**—বিভাগ অনুসারে; **তস্য**—তার; **কর্তারম্**—স্রষ্টা; **অপি**—যদিও; **মাম্**—আমাকে; **বিদ্ধি**—জানবে; **অকর্তারম্**—অকর্তারূপে; **অব্যয়ম্**—পরিবর্তন রহিত।

গীতার গান

চারি বর্ণ সৃষ্টি মোর গুণ কর্ম ভাগে ।
যার যাহা গুণ হয় কহিব সে আগে ॥
তথাপি সে নহি আমি গুণ কর্ম মাঝে ।
যদ্যপি নিয়ন্তা আমি সকলের কাজে ॥

অনুবাদ

প্রকৃতির তিনটি গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি মানব-সমাজে চারিটি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছি। আমি এই প্রথার স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবে।

তাৎপর্য

ভগবানই সব কিছুর স্রষ্টা। তাঁর থেকেই সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তিনিই সব কিছু রক্ষা করেন, আবার প্রলয়ের পরে সব কিছু তাঁরই মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সমাজের চারটি বর্ণও তাঁরই সৃষ্টি। সমাজের সর্বোচ্চ স্তর সৃষ্টি হয়েছে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি-মত্তাসম্পন্ন লোকদের নিয়ে, তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ এবং তাঁরা সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত। এর পরের স্তর হচ্ছে শাসক সম্প্রদায়, এদের বলা হয় ক্ষত্রিয় এবং এরা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। তার পরের স্তর হচ্ছে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, এদের বলা হয় বৈশ্য এবং এরা রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। তার পরের স্তর হচ্ছে শ্রমজীবী সম্প্রদায়, এদের বলা হয় শূদ্র, এরা তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। ভগবান যদিও এই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছেন, তবুও তিনি এই বর্ণের অন্তর্ভুক্ত নন। কারণ তিনি মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ জীবের মতো নন। জীব হচ্ছে ভগবানের অণুসদৃশ অংশ-বিশেষ, কিন্তু ভগবান হচ্ছেন বিভু। প্রকৃতপক্ষে, মানব-সমাজ হচ্ছে যে-কোনও পশু-সমাজেরই মতো, কিন্তু মানুষকে পশুর স্তর থেকে প্রকৃত মানুষের স্তরে উন্নীত করবার জন্য ভগবান এই চারটি বর্ণ-বিভাগ করেছেন, যাতে মানুষ সুষ্ঠুভাবে পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে কৃষ্ণভাবনাময় হতে পারে। গুণ অনুসারে মানুষের কর্ম নির্ধারিত হয়। জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে জীবনের বিভিন্ন লক্ষণ *ভগবদ্গীতার* অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে, কৃষ্ণভক্ত বা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের থেকেও উত্তম। যদিও গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম বা পরব্রহ্মের জ্ঞানসম্পন্ন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির উপাসক। তাঁরা সবিশেষ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন না। বিষ্ণুতত্ত্ব বা কৃষ্ণতত্ত্বকে উপলব্ধি করতে হয় ব্রহ্মতত্ত্বকে অতিক্রম

করে এবং তখন তিনি বৈষ্ণব পদবাচ্য হন। কৃষ্ণতত্ত্ব রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি সব কয়টি অংশ-অবতারের তত্ত্ব সমন্বিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন সমাজের চার বর্ণের অতীত, তাঁর ভক্তও তেমন এই বর্ণ-বিভাগের অতীত, এমন কি তিনি জাতি, কুলাদি বিচারেরও অতীত।

শ্লোক ১৪

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা ।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

ন—না; **মাম্**—আমাকে; **কর্মাণি**—সর্বপ্রকার কর্ম; **লিম্পন্তি**—প্রভাবিত করতে পারে; **ন**—না; **মে**—আমার; **কর্মফলে**—কর্মফলে; **স্পৃহা**—আকাঙ্ক্ষা; **ইতি**—এভাবে; **মাম্**—আমাকে; **যঃ**—যিনি; **অভিজানাতি**—জানেন; **কর্মভিঃ**—এই প্রকার কর্মের দ্বারা; **ন**—না; **সঃ**—তিনি; **বধ্যতে**—আবদ্ধ হন।

গীতার গান

আমি কর্মফলে লিপ্ত নহি কোন কালে ।
স্পৃহা কভু নাই মোর কোন কর্মফলে ॥
আমার কর্মের কথা বুঝে ভাল মতে ।
বন্ধন ঘুচিল তার কর্মের ফলেতে ॥

অনুবাদ

কোন কর্মই আমাকে প্রভাবিত করতে পারে না এবং আমিও কোন কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা করি না। আমার এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনিও কখনও সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের সংবিধানে উল্লেখ থাকে যে, রাজা কোন ভুল করতে পারেন না, অথবা রাজা রাষ্ট্রের আইনের অধীন নন। তেমনই এই জড় জগতের অধীশ্বর ভগবানও জড় জগতের কোন কর্মের দ্বারাই আবদ্ধ নন। যদিও তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তবুও এই জড় জগৎ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও উদাসীন। কিন্তু জীব জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করতে চায় বলে কর্মফলের

বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক যেমন তাঁর কর্মচারীদের সৎ-অসৎ কোন কর্মের জন্যই দায়ী নন, কর্মচারীরাই তার জন্যে দায়ী হয়ে থাকে, জীবও তেমনই তার কর্মফল ভোগ করে থাকে। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার জন্য জীব নানা রকম কর্ম করে চলে। ভগবান কখনও এই ধরনের কর্ম করার বিধান দেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীব উত্তরোত্তর আরও বেশি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করবার জন্য এই সংসারে কর্ম করে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গসুখ ভোগ করার কামনা করে। ভগবান যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাই তাঁর তথাকথিত স্বর্গসুখের প্রতি কোন রকম আকর্ষণ নেই। স্বর্গের দেব-দেবীরা হচ্ছেন ভগবানেরই দাস-দাসী, যাঁদের ভগবান নিজেই নিয়োজিত করেছেন। কর্মচারীরা যে প্রকার নিম্নস্তরের সুখভোগ করতে চায়, মালিক কখনই তা চায় না। ভগবানেরও তেমনই জড় সুখভোগ করার কোন স্পৃহা নেই। তিনি সব সময়ই জাগতিক কর্ম এবং তার ফল সম্বন্ধে নিরাসক্ত থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, পৃথিবীতে নানা রকম গাছপালা সৃষ্টির জন্য বৃষ্টি দায়ী নয়, যদিও বৃষ্টির অভাবে কোন গাছপালা জন্মানোর সম্ভাবনাই থাকে না। বৈদিক *স্মৃতিতে* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

নিমিত্তমাত্রমেবাসৌ সৃজ্যানাং সর্গকর্মণি ।
প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ ॥

"এই জড় সৃষ্টির পরম কারণ হচ্ছেন একমাত্র ভগবান। জড়া প্রকৃতি হচ্ছে নিমিত্ত কারণ, যার ফলে জড় সৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করা যায়।" সৃষ্ট জীব অনেক রকম, যেমন—দেবতা, মানুষ, পশু, পাখি আদি এবং তারা সকলেই তাদের পূর্বকৃত পুণ্য অথবা পাপকর্ম অনুসারে সুখ ও দুঃখ পেয়ে থাকে। ভগবান তাদের প্রকৃতির গুণ অনুসারে কর্ম করার সব রকম সুযোগ দেন। কিন্তু তিনি নিজে তাদের ভূত ও ভবিষ্যৎ কোন কর্মের জন্য দায়ী হন না। *বেদান্ত-সূত্রে* (২/১/৩৪) বলা হয়েছে, *বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ*—ভগবান সর্বদাই নিরপেক্ষ থাকেন, তিনি কোন জীবের প্রতি পক্ষপাতযুক্ত নন। জীব তার নিজের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করে এবং সেই সমস্ত কর্মের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার নিজের। ভগবান বহিরঙ্গা শক্তি জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে জীবের সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করবার সুযোগ প্রদান করেন। সকাম কর্মের এই জটিল তত্ত্ব যিনি বুঝতে পারেন, তিনি তাঁর কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, তিনি কৃষ্ণভাবনার অমৃত আস্বাদন করেন, তার ফলে কর্মের অধীন হন না। ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্ব বুঝতে না পেরে যে মনে করে, ভগবানও আর পাঁচটি

বদ্ধ জীবের মতো কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ, তারা কোন দিনই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু যিনি পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন, তিনি মুক্তাত্মারূপে কৃষ্ণভাবনায় দৃঢ়চিত্ত হতে পারেন।

শ্লোক ১৫

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

এবম্—এভাবে; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **কৃতম্**—অনুষ্ঠান করেছেন; **কর্ম**—কর্ম; **পূর্বৈঃ**—প্রাচীন; **অপি**—যদিও; **মুমুক্ষুভিঃ**—মুক্তিকামীগণ কর্তৃক; **কুরু**—কর; **কর্ম**—শাস্ত্রোক্ত কর্ম; **এব**—অবশ্যই; **তস্মাৎ**—অতএব; **ত্বম্**—তুমি; **পূর্বৈঃ**—প্রাচীন মহাজনগণ কর্তৃক; **পূর্বতরম্**—প্রাচীনকালে; **কৃতম্**—অনুষ্ঠিত।

গীতার গান

এই গূঢ় তত্ত্বকথা পূর্বে যে বুঝিল ।
অনায়াসে তারা সব সংসার তরিল ॥
তুমি পূর্ব মহাজনে যথা অনুসার ।
যথাবৎ সিদ্ধিলাভ হইবে বিস্তর ॥

অনুবাদ

প্রাচীনকালে সমস্ত মুক্ত পুরুষেরা আমার অপ্রাকৃত তত্ত্ব অবগত হয়ে কর্ম করেছেন। অতএব তুমিও সেই প্রাচীন মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তোমার কর্তব্য সম্পাদন কর।

তাৎপর্য

পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর মানুষ আছে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষের হৃদয় সব রকমের কলুষে পরিপূর্ণ এবং অন্য শ্রেণীর মানুষের হৃদয় অত্যন্ত নির্মল। কৃষ্ণভাবনার অমৃত—ভগবদ্ভক্তি এই দুই শ্রেণীর লোকেরই হিত সাধন করে। যাদের হৃদয় কলুষে পরিপূর্ণ, তারা বিধিভক্তির অনুশীলন করে তাদের হৃদয়কে পরিষ্কার করতে পারে—তাদের হৃদয়ের আবর্জনা দূর করতে পারে; আর যাদের হৃদয় ইতিমধ্যেই পবিত্র হয়ে আছে, তারা কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে আর

সকলকে কৃষ্ণভক্তি লাভ করার শিক্ষা দান করতে পারে। যারা মূর্খ, অথবা যাদের মনে কৃষ্ণভক্তির পূর্ণ প্রকাশ হয়নি, তারা অনেক সময় মনে করে, সব রকমের কাজকর্ম পরিত্যাগ করে নির্জনে ভগবদ্ভজন করাটাই হচ্ছে পরমার্থ সাধন করার পন্থা। কিন্তু এই ধারণাটি ভ্রান্ত। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন যখন কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করে বনবাসী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তা থেকে নিরস্ত করেন। আমাদের কেবলমাত্র জানতে হবে কিভাবে কর্ম করতে হয়। কৃষ্ণভক্তির ভান করে কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করাটা মূঢ়তা। যথার্থ কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার উদ্দেশ্যে সব রকম কাজকর্ম করা। তাই ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কৃষ্ণভক্ত মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে। ভগবান ত্রিকালজ্ঞ, তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত কথাই জানেন। তাঁর ভক্তেরা কখন কিভাবে তাঁর সেবা করেছেন, সেই কথা তিনি কখনও ভোলেন না। তাই তিনি সূর্যদেব বিবস্বানের উদাহরণ দিয়ে অর্জুনকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলেন। এই বিবস্বানকে বারো কোটি বছর আগে ভগবান নিজেই *ভগবদ্গীতার* তত্ত্বজ্ঞান দান করেছিলেন। এই সমস্ত ভগবদ্ভক্ত মহাজনেরা সকলেই মুক্ত পুরুষ এবং তাঁরা সকলেই সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে তাঁর সেবায় রত। তাই, তিনি অর্জুনকে উপদেশ দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের উপদেশ দিয়েছেন যে, ভগবদ্ভক্ত মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবানের সেবায় কর্তব্যকর্ম করাটাই হচ্ছে সিদ্ধি লাভের একমাত্র উপায়।

শ্লোক ১৬

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬ ॥

কিম্—কি; **কর্ম**—কর্ম; **কিম্**—কি; **অকর্ম**—অকর্ম; **ইতি**—এভাবে; **কবয়ঃ**—বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ; **অপি**—ও; **অত্র**—এই বিষয়ে; **মোহিতাঃ**—মোহিত হন; **তৎ**—তাই; **তে**—তোমাকে; **কর্ম**—কর্ম; **প্রবক্ষ্যামি**—আমি বিশ্লেষণ করব; **যৎ**—যা; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **মোক্ষ্যসে**—তুমি মুক্ত হবে; **অশুভাৎ**—অশুভ অবস্থা থেকে।

গীতার গান

কিবা কর্ম অকর্ম বা করিতে বিচার ।
বড় বড় মুনি ঋষি হয় চমৎকার ॥

তাই সে বলিব আমি কিবা কর্ম হয় ।
জানিলে সে তত্ত্বকথা অশুভের ক্ষয় ॥

অনুবাদ

কাকে কর্ম ও কাকে অকর্ম বলে, তা স্থির করতে বিবেকী ব্যক্তিরাও মোহিত হন। আমি সেই কর্ম বিষয়ে তোমাকে উপদেশ করব। তুমি তা অবগত হয়ে সমস্ত অশুভ অবস্থা থেকে মুক্ত হবে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্ত মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করা সকলেরই কর্তব্য। পূর্ববর্তী শ্লোকে ভগবান যে উপদেশ দিয়েছেন, পরবর্তী শ্লোকে তিনি তার ব্যাখ্যা করে বলেছেন, কেন স্বাধীনভাবে ভগবানের সেবা করা উচিত নয়।

এই অধ্যায়ের প্রথমেই বর্ণনা করা হয়েছে, পরম্পরার ধারায় ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন এমন কোন মহাপুরুষকে গুরুরূপে বরণ করতে হয়। ভগবান নিজেই ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান সর্বপ্রথমে সূর্যদেব বিবস্বানকে দান করেন। সেই তত্ত্বজ্ঞান বিবস্বান তাঁর পুত্র মনুকে দান করেন, মনু তা তাঁর পুত্র ইক্ষ্বাকুকে দান করেন। এভাবেই সৃষ্টির আদি থেকে এই তত্ত্বজ্ঞান প্রবাহিত হয়ে আসছে। তাই গুরু-শিষ্য পরম্পরায় পূর্বতন যে সমস্ত মহান আচার্যেরা রয়েছেন, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই এই জ্ঞান আহরণ করতে হয়। মানুষ যত বুদ্ধিমানই হোক না কেন, গুরু-পরম্পরার ধারায় এই জ্ঞান আহরণ না করলে, সে কখনই কৃষ্ণভাবনাময় তত্ত্বকে প্রামাণ্যরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। সেই জন্যই ভগবান নিজে অর্জুনকে এই তত্ত্বজ্ঞান সরাসরি দান করতে মনস্থ করলেন। অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যদি কেউ ভগবানের দেওয়া এই তত্ত্বজ্ঞান আহরণ করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে জড় জগতের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে পারেন।

কেবলমাত্র জাগতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে ধর্মীয় পন্থাগুলি কখনই নিরূপণ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, একমাত্র ভগবানই পরমতত্ত্ব সম্বলিত ধর্মনীতি প্রণয়ন করতে পারেন। *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্* (*ভাঃ* ৬/৩/১৯)। জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে একটি মনগড়া ধর্ম তৈরি করলে তাকে ধর্ম বলে গ্রহণ করা যায় না। ব্রহ্মা, শিব, নারদ, মনু, কুমার, কপিল, প্রহ্লাদ, ভীষ্ম, শুকদেব গোস্বামী, যমরাজ, জনক, বলী মহারাজ আদি মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের ধর্মের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হয় এবং তা অনুশীলন করতে হয়। কল্পনা ও অনুমানের ভিত্তিতে আমরা আত্ম-উপলব্ধির পন্থা প্রতিপাদন করতে

পারি না। তাই ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার বশবর্তী হয়ে সরাসরি অর্জুনকে সেই জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, শুধুমাত্র কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের মাধ্যমেই আমরা এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি।

শ্লোক ১৭

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্মণঃ ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

কর্মণঃ—কর্মের; **হি**—অবশ্যই; **অপি**—ও; **বোদ্ধব্যম্**—জানা উচিত; **বোদ্ধব্যম্**—জ্ঞাতব্য; **চ**—ও; **বিকর্মণঃ**—শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম; **অকর্মণঃ**—অকর্ম; **চ**—ও; **বোদ্ধব্যম্**—জ্ঞাতব্য; **গহনা**—অত্যন্ত কঠিন; **কর্মণঃ**—কর্মের; **গতিঃ**—গতি।

গীতার গান

কর্ম যে বুঝিতে তুমি অকর্ম বুঝিবে ।
বিকর্ম বুঝিতে তথা ভাবে বুদ্ধ হবে ॥
দুর্গম কর্মের গতি নিগূঢ় সে তত্ত্ব ।
যে বুঝিল সে বুঝিল তাহার মহত্ত্ব ॥

অনুবাদ

কর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। তাই কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানা কর্তব্য।

তাৎপর্য

কেউ যদি সত্যিই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, তবে তাকে কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের পার্থক্য জানতে হবে। তাকে জানতে হবে ভগবৎ-তত্ত্ব কি, ভগবানের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক এবং এই জড় জগতের বিভিন্ন গুণের প্রভাবে সে কিভাবে তার কর্তব্যকর্ম করে। এই তত্ত্বের উপলব্ধিই হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধি। এই তত্ত্ব পূর্ণরূপে যে উপলব্ধি করতে পারে, সে-ই বুঝতে পারে যে, *জীবের 'স্বরূপ' হয়—'কৃষ্ণের নিত্যদাস'*। তাই কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবা করাই প্রতিটি জীবের পরম কর্তব্য। সমগ্র *ভগবদ্গীতায়* ভগবান আমাদের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষাই দান করেছেন। যে চিন্তাধারা এবং যে কর্ম এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে, তাকে বলা হয় বিকর্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম। এই তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে

উপলব্ধি করতে হলে মানুষকে কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তের সঙ্গ করতে হয়—সাধুসঙ্গ করতে হয় এবং তাদের কাছ থেকে এই জ্ঞানের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে হয়। ভগবদ্ভক্তের কাছ থেকে এই জ্ঞান আহরণ করা এবং ভগবানের কাছ থেকে তা আহরণ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই পরম তত্ত্বজ্ঞান এভাবেই সদ্‌গুরুর কাছ থেকে আহরণ না করলে বড় বড় বুদ্ধিমান মানুষেরা পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এই জ্ঞানের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না।

শ্লোক ১৮

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ ।
স বুদ্ধিমান্মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

কর্মণি—কর্মে; **অকর্ম**—অকর্ম; **যঃ**—যিনি; **পশ্যেৎ**—দর্শন করেন; **অকর্মণি**—অকর্মে; **চ**—ও; **কর্ম**—কর্ম; **যঃ**—যিনি; **সঃ**—তিনি; **বুদ্ধিমান্**—বুদ্ধিমান; **মনুষ্যেষু**—মানব-সমাজে; **সঃ**—তিনি; **যুক্তঃ**—চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত; **কৃৎস্নকর্মকৃৎ**—সব রকম কর্মে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও।

গীতার গান

কর্মেতে অকর্ম দেখে অকর্মে যে কর্ম ।
সে বুদ্ধিমান মনুষ্যে সে বুঝেছে মর্ম ॥

অনুবাদ

যিনি কর্মে অকর্ম দর্শন করেন এবং অকর্মে কর্ম দর্শন করেন, তিনিই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান। সব রকম কর্মে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হয়ে যে মানুষ ভগবানের সেবায় ব্রতী হয়েছেন, তিনি স্বাভাবিকভাবে সব রকমের কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত। তিনি তাঁর সমস্ত কর্মই করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য। তাই তাঁর কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাঁকে আর সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করতে হয় না। এভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যাঁরা ব্রতী হয়েছেন, তাঁরাই মানব-সমাজে যথার্থ বুদ্ধিমান মানুষ। *অকর্ম* কথাটার অর্থ হচ্ছে কর্মফল রহিত কর্ম। নির্বিশেষবাদীরা কর্মফলের ভয়ে ভীত হয়ে সব রকম কর্ম

পরিত্যাগ করে। তারা মনে করে, কর্ম করলেই তার ফল ভোগ করতে হবে এবং এই সমস্ত কর্মফল তাদের মুক্তির পথে প্রতিবন্ধক-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু ভগবানের ভক্ত ভালভাবেই জানেন, তিনি হচ্ছেন ভগবানের নিত্যদাস। তাই তিনি সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। ভগবানের সেবা করার জন্য তিনি সমস্ত কাজকর্ম করেন, তাই সেই সমস্ত কর্মের ফল ভগবানই গ্রহণ করেন, তাঁকে আর তা ভোগ করতে হয় না। এভাবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার ফলে তিনি সব রকম কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং সর্বদা চিন্ময় আনন্দ উপভোগ করেন। তাই বলা হয়, 'কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম', কারণ তাঁর ব্যক্তিগত কোন কামনা নেই। তিনি তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করবার জন্য কোন কিছুই আশা করেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসত্ব করার পরম আনন্দ লাভের ফলে তিনি জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সমস্ত বাসনার নিরর্থকতা উপলব্ধি করতে পারেন এবং তার ফলে তিনি সম্পূর্ণভাবে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ১৯

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

যস্য—যাঁর; **সর্বে**—সব রকম; **সমারম্ভাঃ**—কর্ম প্রচেষ্টা; **কাম**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা; **সংকল্প**—সংকল্প; **বর্জিতাঃ**—রহিত; **জ্ঞান**—জ্ঞানের; **অগ্নি**—অগ্নি দ্বারা; **দগ্ধ**—দগ্ধ; **কর্মাণম্**—কর্মসমূহ; **তম্**—তাঁকে; **আহুঃ**—বলেন; **পণ্ডিতম্**—পণ্ডিত; **বুধাঃ**—জ্ঞানীগণ।

গীতার গান

সকল সমারম্ভে যার সংকল্প বর্জন ।
জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ কর্ম পাণ্ডিত্যে গ্রহণ ॥

অনুবাদ

যাঁর সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টা কাম ও সংকল্প রহিত, তিনি পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত। জ্ঞানীগণ বলেন যে, তাঁর সমস্ত কর্মের প্রতিক্রিয়া পরিশুদ্ধ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে।

তাৎপর্য

যে মানুষ প্রকৃতই জ্ঞানবান, তিনিই কেবল কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত বৈষ্ণবের কার্যকলাপ বুঝতে পারেন। কারণ, কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব সব রকম ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিষয়ক বাসনা থেকে মুক্ত। তাঁর স্বরূপ যে ভগবানের নিত্যদাস, এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারার ফলে তাঁর অন্তর কলুষমুক্ত হয়েছে। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির আগুনে তাঁর অন্তরের সমস্ত কলুষ দগ্ধ হয়ে যায়। এভাবেই অন্তর যখন কলুষমুক্ত হয়, তখন জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার সমস্ত কামনা অন্তর্হিত হয়, তাই তিনি তখন নিষ্কাম। প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই, যিনি এই পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পেরেছেন। ভগবানের নিত্য দাসত্বের এই পরম তত্ত্বজ্ঞানকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই আগুন একবার জ্বলে উঠলে, তা সব রকম কর্মফলকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিতে পারে।

শ্লোক ২০

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥

ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে; **কর্মফলাসঙ্গম্**—কর্মফলের আসক্তি; **নিত্য**—সর্বদা; **তৃপ্তঃ**—পরিতৃপ্ত; **নিরাশ্রয়ঃ**—আশ্রয়শূন্য; **কর্মণি**—কর্মে; **অভিপ্রবৃত্তঃ**—পূর্ণরূপে প্রবৃত্ত; **অপি**—সত্ত্বেও; **ন**—না; **এব**—অবশ্যই; **কিঞ্চিৎ**—কিছুই; **করোতি**—করেন; **সঃ**—তিনি।

গীতার গান

ত্যক্ত কর্মফলাসঙ্গ আশ্রয় বিহীন ।
নিত্য তৃপ্ত নিত্যানন্দ নিজ কর্মে লীন ॥
সে প্রবৃত্ত নিজ কর্মে কিছু নাহি করে ।
অনাসক্ত কর্মফল স্বচ্ছন্দ বিহরে ॥

অনুবাদ

যিনি কর্মফলের আসক্তি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে সর্বদা তৃপ্ত এবং কোন রকম আশ্রয়ের অপেক্ষা করেন না, তিনি সব রকম কর্মে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও কর্মফলের আশায় কোন কিছুই করেন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধানের জন্য সব রকম কর্ম করার মাধ্যমেই কেবল কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করেছেন যে ভক্ত, তিনি বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্ম করেন, তাই তিনি কোন রকম কর্মফলের আশা করেন না। তিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত, তাই তিনি কিভাবে তাঁর জীবন ধারণ করবেন, সেই সম্বন্ধেও কোন রকম চিন্তা করেন না। তিনি জানেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর এবং তিনি সর্ব কারণের কারণ, তাই তিনি সব কিছুই ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করেন। তিনি কিছুই সংগ্রহ বা সঞ্চয় করতে চান না, কিংবা এ যাবৎ যা কিছু তিনি তাঁর অধিকারে লাভ করেছেন, সেই সবও সংরক্ষণ করে রাখতে চান না। তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত সম্পদ দিয়ে তিনি কেবল ভগবানেরই সেবা করেন, এ ছাড়া আর কোন কাজেই তাঁর কোন রকম স্পৃহা থাকে না। এই ধরনের নিরাসক্ত কৃষ্ণভক্ত ভাল ও মন্দ সব রকম কর্মফল থেকে মুক্ত; যেন তিনি কোন কাজকর্মই করছেন না। এই হচ্ছে অকর্ম অর্থাৎ কর্মফলহীন কাজকর্মের লক্ষণ। তাই, কৃষ্ণভাবনা রহিত যে সব কর্ম, তা সবই জীবকে কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। তাকে বলা হয় বিকর্ম, এই কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

শ্লোক ২১

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥

নিরাশীঃ—কামনাশূন্য; **যত**—সংযত; **চিত্তাত্মা**—মন ও বুদ্ধি; **ত্যক্ত**—পরিত্যাগ করে; **সর্ব**—সমস্ত; **পরিগ্রহঃ**—আধিপত্য করার প্রবৃত্তি; **শারীরম্**—শরীর রক্ষার্থে; **কেবলম্**—কেবল; **কর্ম**—কর্ম; **কুর্বন্**—করেও; **ন**—না; **আপ্নোতি**—লাভ করেন; **কিল্বিষম্**—পাপ।

গীতার গান

কর্মফলে স্পৃহাহীন দত্ত চিত্ত আত্মা ।
সর্ব পরিগ্রহ ত্যক্ত যুক্ত সে সর্বথা ॥
শরীর নির্বাহ মাত্র কর্ম যেই করে ।
করিয়াও সর্ব কর্ম সর্ব পাপ হরে ॥

অনুবাদ

এই প্রকার জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর মন ও বুদ্ধিকে সর্বতোভাবে সংযত করে কার্য করেন। তিনি প্রভুত্ব করার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে কেবল জীবন ধারণের জন্য কর্ম করেন। এভাবেই কর্ম করার ফলে কোন রকম পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনার অমৃত যিনি লাভ করেছেন, তিনি তাঁর কাজকর্মের ফলস্বরূপ শুভ অথবা অশুভ কোন ফলেরই আশা করেন না। তাঁর মন, বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে সংযত। তিনি জানেন যে, যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই পরমেশ্বরের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে তাঁর কোন কাজকর্মই তাঁর নিজের কাজকর্ম নয়, সেই কাজকর্ম করা হয় ভগবানেরই নিয়ন্ত্রণে। যেমন, আমরা যখন আমাদের হাতটিকে নাড়ি, তখন হাতটি নিজের ইচ্ছায় নড়ে না। সমস্ত শরীরের প্রচেষ্টার ফলেই তা সম্পন্ন হয়। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত ভগবানের বাসনার দ্বারাই পরিচালিত হন, কেন না তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কোন রকম বাসনা নেই। একটি যন্ত্রের অংশ যেভাবে পরিচালিত হয়, তিনিও সেভাবেই পরিচালিত হন। যন্ত্রের কলকব্জায় যেমন তেল দিতে হয়, পরিষ্কার করতে হয়, ভগবদ্ভক্তও তেমন ভগবানের সেবা করার জন্যই কেবল নিজেকে সুস্থ-সবল রাখেন। তাই তিনি সব রকম কর্মফল থেকে মুক্ত। যেমন, একটি পশুর নিজের দেহের উপরেই কোন মালিকানার অধিকার নেই। পশুর নিষ্ঠুর মালিক ইচ্ছা করলেই সেই পশুটিকে বলি দিতে পারে, তবু পশুটি কোন প্রতিবাদ করে না। তার সত্যিই কোন স্বাধীনতা নেই। ভগবদ্ভক্তও তেমনই নির্বিকার। সম্পূর্ণভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়ে তিনি যখন পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করেন, তিনি যখন পরম সত্যকে দর্শন করেন, তখন জড় জগতের উপর আধিপত্য করার কোন বাসনা তাঁর থাকে না। জীবন ধারণের জন্য অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টাকে তিনি তখন নিতান্তই হাস্যকর বলে মনে করেন। তাই, এই সমস্ত জড়-জাগতিক পাপের দ্বারা তিনি আর কলুষিত হন না। তখন তিনি তাঁর সব রকমের কাজকর্মের ফল থেকে মুক্ত থাকেন।

শ্লোক ২২

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

যদৃচ্ছা—অনায়াসে; **লাভ**—লাভে; **সন্তুষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **দ্বন্দ্ব**—দ্বন্দ্ব; **অতীতঃ**—অতীত; **বিমৎসরঃ**—মাৎসর্যমুক্ত; **সমঃ**—স্থির; **সিদ্ধৌ**—সিদ্ধি লাভে; **অসিদ্ধৌ**—অসাফল্যে; **চ**—ও; **কৃত্বা**—করলেও; **অপি**—যদিও; **ন**—না; **নিবধ্যতে**—প্রভাবিত হন।

গীতার গান

যথালাভ তথা তুষ্ট সর্ব দ্বন্দ্বমুক্ত ।
নির্মৎসর সমচিত্ত নিজ কর্মে যুক্ত ॥
সিদ্ধাসিদ্ধ সমদৃষ্টি নাহিত বিদ্বেষ ।
করিয়াও সর্ব কর্ম কর্মফল শেষ ॥

অনুবাদ

যিনি অনায়াসে যা লাভ করেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ আদি দ্বন্দ্বের বশীভূত হন না এবং মাৎসর্যশূন্য, যিনি কার্যের সাফল্য ও অসাফল্যে অবিচলিত থাকেন, তিনি কর্ম সম্পাদন করলেও কর্মফলের দ্বারা কখনও আবদ্ধ হন না।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করেছেন যে মানুষ, তিনি তাঁর শরীর সংরক্ষণের জন্যও অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করেন না। অনায়াসে তিনি যা পান, তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। অযাচিতভাবে তাঁর কাছে যা আসে, তিনি কেবল তা-ই গ্রহণ করেন। তিনি ভিক্ষা করেন না, আবার ঋণও করেন না। তাঁর সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করে চলেন এবং তার ফলে তিনি যা পান, তা ভগবানের দান বলে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকেন। তাই, তাঁর জীবন ধারণের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। শ্রীকৃষ্ণের দাসত্বে বিঘ্ন হবে বলে, তিনি অন্য আর কারও দাসত্ব করেন না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করার জন্য তিনি যে কোন রকম কাজ করতে প্রস্তুত থাকেন। জড় জগতের দ্বন্দ্বভাব—শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, তাঁকে কোন অবস্থাতেই প্রভাবিত করতে পারে না। কৃষ্ণভাবনামৃতের আস্বাদ লাভ করার ফলে তিনি জড় ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত, তাই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির প্রকাশ-স্বরূপ এই দ্বন্দ্বভাব থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থেকে সর্ব অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করতে চেষ্টা করেন। তাই সাফল্য ও ব্যর্থতা—এই দুয়ের প্রভাব থেকেই তিনি মুক্ত থাকেন। পূর্ণরূপে যিনি ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁর মধ্যে এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকট হয়।

শ্লোক ২৩

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

গতসঙ্গস্য—জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতি অনাসক্ত ব্যক্তি; **মুক্তস্য**—মুক্ত; **জ্ঞানাবস্থিত**—চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত; **চেতসঃ**—চিত্ত; **যজ্ঞায়**—যজ্ঞের (শ্রীকৃষ্ণের) উদ্দেশ্যে; **আচরতঃ**—আচরণ করে; **কর্ম**—কর্ম; **সমগ্রম্**—সম্পূর্ণরূপে; **প্রবিলীয়তে**—লয় প্রাপ্ত হয়।

গীতার গান

অসঙ্গ নিযুক্ত জ্ঞানী চিত্তে ক্ষোভ নাই ।
জ্ঞানাবস্থিত সেই সর্বদা সব ঠাঁই ॥
সেই সে যাজ্ঞিক সদা আচরণে দক্ষ ।
তার কর্ম প্রবিলীত একান্ত সমক্ষ ॥

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, চিন্ময় জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে কর্ম সম্পাদন করেন, সেই সকল কর্ম সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভক্তি লাভ করে মানুষ যখন দ্বন্দ্বভাব থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি প্রকৃতির ত্রিগুণের কলুষ থেকে মুক্তি লাভ করেন। তিনি তখন যথার্থ মুক্ত, কারণ তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারেন এবং তখন আর তাঁর মন কৃষ্ণভাবনা থেকে বিচলিত হয় না। তখন তিনি যা-ই করেন, তা কেবল আদি বিষ্ণু—শ্রীকৃষ্ণের জন্যই করেন। তাই, তাঁর সমস্ত কাজকর্ম যজ্ঞময় হয়ে ওঠে, কারণ যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করা। তাঁর সমস্ত কাজকর্মই অপ্রাকৃত তত্ত্বে পর্যবসিত হয়, তাই তাঁকে আর কর্মফল-জনিত ক্লেশভোগ করতে হয় না।

শ্লোক ২৪

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্ম—চিন্ময় প্রকৃতি; **অর্পণম্**—অর্পণ; **ব্রহ্ম**—পরম; **হবিঃ**—ঘৃত; **ব্রহ্ম**—চিন্ময়; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **ব্রহ্মণা**—আত্মার দ্বারা; **হুতম্**—নিবেদিত হয়; **ব্রহ্ম**—চিৎ-জগৎ; **এব**—অবশ্যই; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **গন্তব্যম্**—গন্তব্য; **ব্রহ্ম**—চিন্ময়; **কর্ম**—কর্ম; **সমাধিনা**—সমাহিত হয়ে।

গীতার গান

ব্রহ্মময় কর্ম, তার ব্রহ্মেতে অর্পণ ।
ব্রহ্ম হবি ব্রহ্ম অগ্নি হোতা ব্রহ্মফল ॥
তাহার সে ব্রহ্মগতি নিশ্চিত নির্ণয় ।
ব্রহ্ম কর্ম সমাধিস্থ সর্বত্র বিজয় ॥

অনুবাদ

যিনি কৃষ্ণভাবনায় সম্পূর্ণ মগ্ন তিনি অবশ্যই চিৎ-জগতে উন্নীত হবেন, কারণ তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ চিন্ময়। তাঁর কর্মের উদ্দেশ্য চিন্ময় এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি যা নিবেদন করেন, তাও চিন্ময়।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত কর্মের প্রভাবে কিভাবে পরমার্থ সাধিত হয়, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম নানা প্রকারের হতে পারে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে তা বিশদভাবে বর্ণনা করা হবে। কিন্তু তার আগে, এখানে কেবল কৃষ্ণভাবনার মূল তত্ত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে। বদ্ধ জীব জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত, তাই তাকে নিশ্চিতভাবে জড়-জাগতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কাজকর্ম করতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। যে পন্থা অবলম্বন করে বদ্ধ জীব এই পরিবেশ থেকে মুক্ত হতে পারে, তাকেই বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভগবদ্ভক্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, নানা রকম দুগ্ধজাত খাদ্যের অত্যাহারের ফলে যখন পেটের অসুখ হয়, তখন আর একটি দুগ্ধজাত খাদ্য দইয়ের দ্বারা সেই রোগ নিবারণ করা হয়। ঠিক তেমনই, বিষয়াসক্ত বদ্ধ জীবের ভবরোগ নিরাময় করা যায় *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত কৃষ্ণভাবনার অমৃতের দ্বারা। ভবরোগ নিরাময়ের এই পন্থাকে বলা হয় যজ্ঞ, অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করার জন্য কাজকর্ম বা যজ্ঞ করা। জড় জগতের যত বেশি কার্যকলাপ কৃষ্ণভাবনায় অথবা বিষ্ণুর জন্য অনুষ্ঠিত হয়, সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্টতার ফলে তত বেশি জড় পরিবেশ চিন্ময়ত্ব লাভ করে। *ব্রহ্ম* বলতে বোঝায় 'চিন্ময়'। ভগবান

হচ্ছেন চিন্ময় এবং তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটাকে বলা হয় ব্রহ্মজ্যোতি। বিশ্বচরাচরের সব কিছুই এই ব্রহ্মজ্যোতিতে অবস্থান করছে। কিন্তু সেই জ্যোতি মায়া অথবা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কলুষের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়লে তাকে প্রাকৃত বা জড়-জাগতিক বলা হয়। তখন সব কিছুই জড় বলে প্রতিভাত হয়। এই জড় আবরণকে কৃষ্ণভাবনার প্রভাবে উন্মোচিত করা যায়। তাই, ভগবদ্ভাবনায় ভাবিত হয়ে আমরা যখন ভগবানের চরণে কোন কিছু উৎসর্গ করি, তখন অর্পণ, হবি, অগ্নি, হোতা ও ফল অথবা যখন ভগবানের প্রসাদরূপে কোন কিছু গ্রহণ করি, তখন তা সবই একই তত্ত্বে পর্যবসিত হয়—*ব্রহ্মন্* অথবা পরমতত্ত্ব। পরমতত্ত্ব যখন মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে, তখন তাকে জড় পদার্থ বলে মনে হয়। আবার এই জড় পদার্থ দিয়ে যখন ভগবানের সেবা করা হয়, তখন তা অপ্রাকৃত তত্ত্বে পর্যবসিত হয়। এভাবেই কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভগবদ্ভক্তির দ্বারা আমরা আমাদের জড় চেতনাকে *ব্রহ্মন্* অথবা পরমতত্ত্বে রূপান্তরিত করতে পারি। মন যখন সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকে, তখন তাকে বলা হয় সমাধি। এই প্রকার অপ্রাকৃত চেতনায় যখন কোন কিছু করা হয়, তখন তাকে বলা হয় যজ্ঞ। এই চিন্ময় চেতনায় অর্পণ, অর্পিত হবি, অগ্নি, হোতা—সবই ব্রহ্মময় হয়ে ওঠে, অর্থাৎ অপ্রাকৃত তত্ত্বে পর্যবসিত হয়। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার পদ্ধতি।

শ্লোক ২৫

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে ।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

দৈবম্—দেবতাদের পূজায়; **এব**—এভাবে; **অপরে**—অন্য অনেকে; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞ; **যোগিনঃ**—যোগিগণ; **পর্যুপাসতে**—যথাযথভাবে উপাসনা করেন; **ব্রহ্ম**—চিন্ময় তত্ত্বরূপ; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **অপরে**—অন্যেরা; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞ; **যজ্ঞেন**—যজ্ঞের দ্বারা; **এব**—এভাবে; **উপজুহ্বতি**—আহুতি প্রদান করেন।

গীতার গান

দৈব যজ্ঞ করে পরে সেও যোগী হয় ।
ব্রহ্মজ্ঞানী সেও যোগী হোমাদি নিলয় ॥

অনুবাদ

কোনও কোনও যোগী দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার মাধ্যমে তাঁদের উপাসনা করেন, আর অন্য অনেকে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে সব কিছু নিবেদন করার মাধ্যমে যজ্ঞ করেন।

তাৎপর্য

পূর্বের বর্ণনা অনুসারে, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে যিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেন, তাঁকে বলা হয় সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। কিন্তু এমনও অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা দেবোপাসনা করার জন্য অনুরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আবার অনেকে আছেন, যাঁরা ব্রহ্ম অথবা ভগবানের নির্বিশেষ রূপের উদ্দেশ্যে সব কিছু উৎসর্গ করেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন লোকে বিভিন্নভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে যজ্ঞ কেবল ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে তুষ্ট করার জন্য অনুষ্ঠিত হয় এবং বিষ্ণুর আর এক নাম যজ্ঞ। সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। তার একটি হচ্ছে জড় সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য এবং অন্যটি হচ্ছে ভগবানকে জানবার জন্য। যাঁরা প্রকৃতই জ্ঞানী, যাঁরা ভগবানের ভক্ত, তাঁরা ভগবানকে তুষ্ট করার জন্য তাঁদের সব কিছুই ভগবানের চরণে অর্পণ করেন। কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা আরও বেশি করে জড় সুখভোগ করবার জন্য ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাদের উপাসনা করে যজ্ঞ করেন। এই সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন অগ্নি, বায়ু, জল, বজ্র আদি প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির পর্যবেক্ষক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাঁদের এই সমস্ত দায়িত্বশীল কর্মে নিয়োগ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত শক্তি ভগবানেরই শক্তি, এগুলি কোন দেবতার নিজস্ব শক্তি নয়। তবে ভগবানের আদেশ অনুসারে তাঁরা এই সমস্ত শক্তির পরিচালনা করেন। যারা জড় সুখভোগ করার জন্য বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুসারে বিভিন্ন যজ্ঞের দ্বারা দেব-দেবীর পূজা করে, তাদের বলা হয় 'বহু-ঈশ্বরবাদী'। আর এক শ্রেণীর অধ্যাত্মবাদী আছেন, যাঁরা পরম-তত্ত্বের নির্বিশেষ রূপের উপাসনা করেন এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর অনিত্যতা অনুভব করে ব্রহ্মজ্যোতিতে তাঁদের পৃথক সত্তা উৎসর্গ করে ব্রহ্মে লীন হয়ে যান। এই সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মতত্ত্বের চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্য দার্শনিক মনোধর্মের পন্থা অবলম্বন করেন। পক্ষান্তরে, সকাম কর্মী ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য তাঁর জাগতিক সম্পদ উৎসর্গ করেন, আর নির্বিশেষবাদী ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবার জন্য তাঁর জড় উপাধিসমূহ উৎসর্গ করেন। নির্বিশেষবাদীদের কাছে যজ্ঞাগ্নি হচ্ছে পরমব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাগ্নিতে তাদের অস্তিত্বের আহুতি হচ্ছে যজ্ঞার্পণ। কিন্তু অর্জুনের মতো কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধানের জন্য সর্বস্ব

অর্পণ করেন—এমন কি তাঁর আত্ম-স্বরূপও ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পিত। এভাবেই, কৃষ্ণভক্ত হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, কিন্তু তিনি কখনও তাঁর পৃথক স্বরূপের বিনাশ সাধন করেন না।

শ্লোক ২৬

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

শ্রোত্রাদীনি—শ্রবণ আদি; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **অন্যে**—অন্যেরা; **সংযম**—সংযমরূপ; **অগ্নিষু**—অগ্নিতে; **জুহ্বতি**—আহুতি দেন; **শব্দাদীন্**—শব্দ আদি; **বিষয়ান্**—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় আদি; **অন্যে**—অন্যেরা; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়রূপ; **অগ্নিষু**—অগ্নিতে; **জুহ্বতি**—আহুতি প্রদান করেন।

গীতার গান

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর যজ্ঞ ইন্দ্রিয় সংযম ।
শ্রোতাদি মানস তপ অগ্নিতে অর্পণ ॥
রূপ রস শব্দ স্পর্শ বিষয়ে সংযম ।
যজ্ঞাহুতি সেই হয় ইন্দ্রিয় হবন ॥

অনুবাদ

কেউ কেউ (শুদ্ধ ব্রহ্মচারীরা) মনঃসংযমরূপ অগ্নিতে শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয়গুলিকে আহুতি দেন, আবার অন্য অনেকে (নিয়মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা) শব্দাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—মানব-জীবনের এই চারটি আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পূর্ণ যোগী হতে সহায়তা করা। পশুদের মতো ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করা মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নয়। তাই, মানব-জীবনের এই চারটি আশ্রমকে এমনভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যাতে মানুষ তার পারমার্থিক জীবনে পূর্ণতা লাভ করতে পারে। ব্রহ্মচারীরা সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে থেকে ইন্দ্রিয় দমন করে মনঃসংযম করেন। এই শ্লোকে তাঁদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে, তাঁরা তাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে এবং অন্যান্য

ইন্দ্রিয়কে চিত্তসংযমরূপী আগুনে অর্পণ করে। ব্রহ্মচারীরা কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনা সম্বন্ধীয় শব্দই শ্রবণ করেন। জ্ঞান আহরণ করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শ্রবণ, তাই প্রকৃত ব্রহ্মচারী সর্বক্ষণ *হরের্নামানুকীর্তনম্* অর্থাৎ, ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে তন্ময় হয়ে থাকেন। তিনি কখনও লৌকিক আলোচনা বা গ্রাম্য কথা শ্রবণ করেন না। জড় জগতের যে শব্দ, সেই শব্দ মনকে জড় বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে—মনকে জড় অভিমুখী করে তোলে। তাই ব্রহ্মচারী কখনও সেই রকম শব্দে কর্ণপাত না করে সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্যনাম শ্রবণ ও কীর্তন করেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

তেমনই আবার যিনি গৃহস্থ, যিনি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার অনুমতি লাভ করেছেন, তিনি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সেই কার্যে লিপ্ত হন। যৌনসঙ্গ, মাদকদ্রব্য সেবন, আমিষ আহার আদির প্রতি মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু সংযমী গৃহস্থ মৈথুনাদি বিষয় বা ইন্দ্রিয়তর্পণে কখনই অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রবৃত্ত হন না। তাই, প্রতিটি সভ্য সমাজেই ধর্মীয় জীবনের ভিত্তিতে বিবাহের প্রচলন দেখা যায়, কারণ সংযত যৌন জীবন যাপনের সেটিই ঠিক পথ। এই ধরনের সংযত, আসক্তি রহিত কামও এক প্রকার যজ্ঞ, কারণ এর মাধ্যমে সংযমী গৃহস্থ তাঁর বিষয়-ভোগোন্মুখ প্রবৃত্তিকে তাঁর পারমার্থিক জীবনের মহৎ উদ্দেশ্যের কাছে উৎসর্গ করেন।

শ্লোক ২৭

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে ।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

সর্বাণি—সমস্ত; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়; **কর্মাণি**—কর্মসমূহ; **প্রাণকর্মাণি**—প্রাণবায়ুর কার্যকলাপ; **চ**—ও; **অপরে**—অন্যেরা; **আত্মসংযম**—মনঃসংযমের; **যোগ**—যুক্ত হওয়ার পন্থা; **অগ্নৌ**—অগ্নিতে; **জুহ্বতি**—আহুতি দেন; **জ্ঞানদীপিতে**—আত্মজ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত।

গীতার গান

সর্বেন্দ্রিয় কর্ম প্রাণ সংযম অগ্নিতে ।
যত্নশীল যত যোগী হবন করিতে ॥

আত্মসংযমাদি যোগ জ্ঞান দীপিতে ।
পৃথক পৃথক যোগী হয় যুক্ত সে যোগেতে ॥

অনুবাদ

মন ও ইন্দ্রিয়-সংযমের মাধ্যমে যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়াসী, তাঁরা তাঁদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ ও প্রাণবায়ু জ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পতঞ্জলি প্রণীত যোগপদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। পতঞ্জলির *যোগসূত্রে* আত্মাকে *প্রত্যগাত্মা* ও *পরাগাত্মা* নামে অভিহিত করা হয়েছে। আত্মা যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত থাকে, তখন তাকে বলা হয় *পরাগাত্মা*। কিন্তু যখনই জীবাত্মা ঐ ধরনের ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ থেকে আসক্তি রহিত হয়, তখন তাকে বলা হয় *প্রত্যগাত্মা*। আত্মা জীবদেহের অভ্যন্তরে দশ রকমের বায়ুর কার্যকলাপের অধীন থাকে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার মাধ্যমে এটি অনুভব করা যায়। পতঞ্জলির যোগপদ্ধতি শিক্ষা দেয় কিভাবে দেহস্থিত বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করে আত্মাকে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করা যায়। এই যোগপদ্ধতি অনুসারে প্রত্যগাত্মাই হচ্ছে চরম উদ্দেশ্য। এই প্রত্যগাত্মা হচ্ছে জড় কার্যকলাপ থেকে প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে। যেমন শ্রবণের জন্য কান, দৃষ্টির জন্য চোখ, ঘ্রাণের জন্য নাক, আস্বাদনের জন্য জিহ্বা ও স্পর্শের জন্য ত্বক এবং এরা সকলেই আত্মার বাইরে নানা রকম কাজকর্ম করে চলেছে। প্রাণবায়ুর ক্রিয়ার প্রভাবে এগুলি সম্ভব হয়। অপান বায়ুর গতি অধোগামী, ব্যান বায়ুর প্রভাবে সংকোচন ও প্রসারণ হয়, সমান বায়ু সমতা বজায় রাখে, আর উদান বায়ু ঊর্ধ্বগামী। প্রবুদ্ধ মানুষ এদের সকলকে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানে নিযুক্ত করেন।

শ্লোক ২৮

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে ।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

দ্রব্যযজ্ঞাঃ—দ্রব্য অর্পণরূপ যজ্ঞ; **তপোযজ্ঞাঃ**—তপস্যার মাধ্যমে যজ্ঞ; **যোগযজ্ঞাঃ**—অষ্টাঙ্গ যোগরূপী যজ্ঞ; **তথা**—তেমনই; **অপরে**—অন্যেরা; **স্বাধ্যায়**—বেদ অধ্যয়নরূপ যজ্ঞ; **জ্ঞানযজ্ঞাঃ**—দিব্যজ্ঞান লাভরূপ যজ্ঞ; **চ**—ও; **যতয়ঃ**—তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ; **সংশিতব্রতাঃ**—কঠোর ব্রতপরায়ণ।

গীতার গান

দ্রব্যযজ্ঞ তপোযজ্ঞ যোগযজ্ঞ যত ।
স্বাধ্যায় যোগীর জ্ঞান শংসিত সে ব্রত ॥

অনুবাদ

কঠোর ব্রত গ্রহণ করে কেউ কেউ দ্রব্য দানরূপ যজ্ঞ করেন। কেউ কেউ তপস্যারূপ যজ্ঞ করেন, কেউ কেউ অষ্টাঙ্গ-যোগরূপ যজ্ঞ করেন এবং অন্য অনেকে পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য বেদ অধ্যয়নরূপ যজ্ঞ করেন।

তাৎপর্য

এই সমস্ত যজ্ঞকে নানা রকম শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। অনেক লোক আছে, যারা নানা রকম দান-ধ্যান করার মাধ্যমে যজ্ঞ সম্পন্ন করে। ভারতবর্ষে অনেক ধনী-বণিক ও রাজ-পরিবারের লোক আছেন, যাঁরা ধর্মশালা, অন্নক্ষেত্র, অতিথিশালা, অনাথাশ্রম, বিদ্যাপীঠ আদি নানা রকম দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য দেশেও হাসপাতাল, বৃদ্ধদের আশ্রয়-ভবন এবং এই ধরনের নানা রকম দাতব্য সংস্থা রয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুঃস্থ-দরিদ্রদের খাদ্যসামগ্রী দান করা, শিক্ষা দান করা ও ঔষধ বিতরণ করা। এই সমস্ত দানকর্মকে বলা হয় *দ্রব্যময়-যজ্ঞ*। অনেক লোক আছেন যাঁরা উন্নততর জীবন অথবা স্বর্গারোহণ করবার জন্য চন্দ্রায়ণ, চাতুর্মাস্য আদি স্বেচ্ছামূলক তপশ্চর্যার অনুশীলন করেন। এই সমস্ত পন্থায় বিশেষ বিধি-নিষেধের মাধ্যমে জীবনযাত্রাকে পরিচালিত করবার জন্য কঠোর ব্রত পালন করতে হয়। যেমন, চাতুর্মাস্য ব্রত পালনকারী চার মাস দাড়ি কামান না, নিষিদ্ধ জিনিস আহার করেন না, দিনে একবারের বেশি দুবার আহার গ্রহণ করেন না, অথবা কখনও গৃহ পরিত্যাগ করেন না। এভাবেই সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করাকে বলা হয় *তপোময়-যজ্ঞ*। আর এক ধরনের লোক আছেন, যাঁরা ব্রহ্মৈক্য লাভ করবার জন্য পাতঞ্জল-যোগ, হঠযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ আদির অনুশীলনে প্রবৃত্ত থাকেন। কেউ আবার সমস্ত পবিত্র তীর্থে ভ্রমণ করেন। এই সমস্ত ক্রিয়াকে বলা হয় *যোগ-যজ্ঞ*, অর্থাৎ এই জড় জগতে বিশেষ ধরনের সিদ্ধি লাভের জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা। অনেকে আছেন, যাঁরা নানা রকম বৈদিক শাস্ত্র, বিশেষ করে *উপনিষদ, বেদান্ত-সূত্র* অথবা *সাংখ্য-দর্শন* পাঠ করেন। এগুলিকে বলা হয় *স্বাধ্যায়-যজ্ঞ*। এই সমস্ত যোগীরা শ্রদ্ধা সহকারে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞে নিয়োজিত এবং তাঁরা উচ্চতর জীবনের অভিলাষী। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত এই সমস্ত যজ্ঞ

থেকে ভিন্ন, কারণ তা হচ্ছে পরম রসমাধুর্যপূর্ণ ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা। উপরোক্ত কোন প্রকার যজ্ঞের মাধ্যমে এই কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভক্তিযোগ লাভ করা যায় না, তা লাভ করা যায় কেবল ভগবান ও তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কৃপার ফলে। তাই, কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে দিব্য, অপ্রাকৃত।

শ্লোক ২৯

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে ।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

অপানে—অধোগামী বায়ুতে; **জুহ্বতি**—আহুতি দেন; **প্রাণম্**—ঊর্ধ্বগামী বায়ুকে; **প্রাণে**—ঊর্ধ্বগামী বায়ুতে; **অপানম্**—অধোগামী বায়ুকে; **তথা**—তেমনই; **অপরে**—অপর কেউ; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **অপান**—অপান বায়ু; **গতী**—গতি; **রুদ্ধ্বা**—নিরোধ করে; **প্রাণায়াম**—শ্বাস-প্রশ্বাস সংযমের মাধ্যমে প্রাণায়াম; **পরায়ণাঃ**—পরায়ণ; **অপরে**—অপর কেউ; **নিয়ত**—নিয়ন্ত্রিত করে; **আহারাঃ**—আহার; **প্রাণান্**—প্রাণবায়ুকে; **প্রাণেষু**—প্রাণবায়ুতে; **জুহ্বতি**—আহুতি প্রদান করেন।

গীতার গান

প্রাণাপান যোগক্রিয়া অপানে হবন ।
প্রাণাপান গতিরুদ্ধ প্রাণায়ামী হন ॥
আহারাদি খর্ব করি নিয়ত আহার ।
প্রাণকে প্রাণেতে দেয় হোমের আকার ॥

অনুবাদ

আর যাঁরা প্রাণায়াম চর্চায় আগ্রহী, তাঁরা অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে এবং প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুতে আহুতি দিয়ে অবশেষে প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি রোধ করে সমাধিস্থ হন। কেউ আবার আহার সংযম করে প্রাণবায়ুকে প্রাণবায়ুতেই আহুতি দেন।

তাৎপর্য

যোগে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের প্রণালীকে বলা হয় প্রাণায়াম। প্রাথমিক স্তরে হঠযোগে বিভিন্ন প্রণালী অভ্যাস করার মাধ্যমে এই প্রাণায়ামের অনুশীলন করা

হয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করবার জন্য এই সমস্ত বিধি বিধান দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত ক্রিয়া অনুশীলন করার ফলে দেহস্থিত বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করে বিপরীত দিকে চালিত করা হয়। অপান বায়ুর গতি নিম্নমুখী এবং প্রাণবায়ুর গতি ঊর্ধ্বমুখী। প্রাণায়াম অনুশীলনের মাধ্যমে যোগী এই বায়ু দুটিকে বিপরীত মুখে চালিত করে তাদের বেগকে দমন করেন এবং 'পূরকে' তাদের ভারসাম্যের সৃষ্টি করেন। এভাবেই নিঃশ্বাসকে যখন প্রশ্বাসে অর্পণ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় 'রেচক'। দুটি বায়ুর গতিকে যখন স্থির করা হয়, তখন তাকে বলা হয় 'কুম্ভক'। এই কুম্ভকের অনুশীলনের ফলে যোগীরা পারমার্থিক উপলব্ধির পূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁদের আয়ু বৃদ্ধি করতে পারেন। প্রবুদ্ধ যোগী একই জন্মে পারমার্থিক উপলব্ধির চরম পূর্ণতা লাভ করতে চান, পরবর্তী জন্মের জন্য প্রতীক্ষা করতে ইচ্ছা করেন না। সেই জন্য, কুম্ভক-যোগ সাধনার মাধ্যমে যোগীরা বহু বহু বছর আয়ু বৃদ্ধি করে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভক্তিযোগে নিত্যযুক্ত কৃষ্ণভক্ত অপ্রাকৃত ভগবৎ-প্রেমে মগ্ন থাকার ফলে, অনায়াসে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করতে সক্ষম হন। তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সর্বক্ষণ ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকে, তাই আর তিনি বিষয়ে প্রবৃত্ত হন না। সুতরাং জীবনের শেষে, তিনি অনায়াসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় স্তরে প্রবেশ করেন। বিভিন্ন যোগক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁর আয়ুকে বর্ধিত করে বহু দিন এই জড় জগতে বাস করার কোন বাসনাই তাঁর থাকে না। সর্ব অবস্থাতেই তিনি মুক্ত পুরুষ। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) বলা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তিমূলক সেবায় নিয়োজিত থাকেন, তিনি জড়া প্রকৃতির গুণগুলিকে অতিক্রম করেন এবং অচিরেই চিন্ময় স্তরে উন্নীত হন।" প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ ভক্ত জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। ব্রহ্মভূত স্তর থেকেই কৃষ্ণভাবনামৃতের শুরু হয়। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত মহাত্মারা তাই সর্বদাই অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত। এই স্তর থেকে তিনি কখনই পতিত হন না এবং অন্তকালে অবিলম্বে তিনি ভগবানের চিন্ময় ধামে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করেন বলে তিনি সর্বদাই অল্পাহারী এবং তার ফলে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদাই সংযত। আর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত না করতে পারলে কোন মতেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

শ্লোক ৩০

সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥

সর্বে—সকলে; **অপি**—আপাতদৃষ্টিতে পৃথক হলেও; **এতে**—এঁরা সকলে; **যজ্ঞবিদঃ**—যজ্ঞবিদ; **যজ্ঞক্ষপিত**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে নির্মল হয়ে; **কল্মষাঃ**—পাপ থেকে; **যজ্ঞশিষ্ট**—এই প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফল; **অমৃতভুজঃ**—অমৃত ভোজনকারীরা; **যান্তি**—লাভ করেন; **ব্রহ্ম**—পরম; **সনাতনম্**—সনাতন প্রকৃতি।

গীতার গান

এই সব তত্ত্ববিৎ ক্ষীণ পাপ হয় ।
ক্রমে ক্রমে পাপহীন ব্রহ্ম সে প্রাপয় ॥
যজ্ঞনিষ্ঠ ভোজী তারা নিষ্পাপ জীবন ।
যোগ্য ব্যক্তি হয় লাভে ব্রহ্ম সনাতন ॥

অনুবাদ

এঁরা সকলেই যজ্ঞতত্ত্ববিৎ এবং যজ্ঞের প্রভাবে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত আস্বাদন করেন, এবং তার পর সনাতন প্রকৃতিতে ফিরে যান।

তাৎপর্য

যজ্ঞাদি সম্পর্কিত পূর্বোক্ত বর্ণনায় জানতে পারা যায় যে, দ্রব্যময়-যজ্ঞ, তপোময়-যজ্ঞ, যাগ-যজ্ঞ, স্বাধ্যায়-যজ্ঞ আদি অনুষ্ঠানের সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়-সংযম করা। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনাই হচ্ছে ভবরোগের মূল কারণ। তাই, ইন্দ্রিয়-সুখের ভোগবাসনা পরিত্যাগ না করতে পারলে সচ্চিদানন্দময় জীবনের স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। এই স্তর হচ্ছে শাশ্বত ব্রহ্ম পরিবেশ। পূর্বোক্ত সব কয়টি যজ্ঞ পাপপূর্ণ জীবনের কলুষ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সাহায্য করে। এই আত্মোন্নতির দ্বারা কেবল এই জীবনেই সুখ-বৈভবের প্রাপ্তি হয়, তাই নয়, তা ছাড়া এই জীবনের শেষে নির্বিশেষ ব্রহ্মৈক্য লাভ অথবা ভগবৎ-ধামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ হয়।

শ্লোক ৩১

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

ন—না; **অয়ম্**—এই; **লোকঃ**—জগৎ; **অস্তি**—আছে; **অযজ্ঞস্য**—যজ্ঞরহিত ব্যক্তির; **কুতঃ**—কোথায়; **অন্যঃ**—অন্য; **কুরুসত্তম**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

ইহলোকে যজ্ঞ বিনা কোন সুখ নাই ।
পরলোক বিনাযজ্ঞে কেমনে সে পাই ॥

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করে কেউই এই জগতে সুখে থাকতে পারে না, তা হলে পরলোকে সুখপ্রাপ্তি কি করে সম্ভব?

তাৎপর্য

জীব যে-রকম দেহই ধারণ করে এই জড় জগতে অবস্থান করুক না কেন, তার যথার্থ স্বরূপ তার কাছে অবধারিতভাবে অজ্ঞাত থাকে। পক্ষান্তরে বলা যায়, জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপের ফলে জীবাত্মা এই জড় জগতে অবস্থান করে। অজ্ঞানতা হচ্ছে এই পাপ-পঙ্কিল জীবনের কারণ এবং জীবন যতক্ষণ পাপের দ্বারা কলুষিত থাকে, ততক্ষণ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। জড় জগতের এই কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে মানব-শরীর। তাই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সাধন করার মাধ্যমে এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পথ *বেদ* দেখিয়ে দিচ্ছে। ধর্মের পথে অগ্রসর হয়ে বিভিন্ন যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে খাদ্য, শস্য, দুধ আদি পর্যাপ্ত মাত্রায় অর্জন করা যায়, তখন অত্যধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও খাদ্যদ্রব্যের কোন অনটন হয় না। দেহের এই সমস্ত স্থূল প্রয়োজনগুলি মিটে গেলে, তখন স্বভাবতই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রশ্ন আসে। তাই, *বেদে* নিয়ন্ত্রিতভাবে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য বিবাহ-যজ্ঞের বিধান বর্ণিত হয়েছে। এভাবেই ধীরে ধীরে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। মুক্ত জীবনের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে ভগবানের সঙ্গ লাভ করা। উপরের বর্ণনা অনুসারে আমরা দেখতে পাই যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে জীবনের পূর্ণতা আসে। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে যদি কেউ এই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, তা হলে সে এই দেহের মাধ্যমে সুখী জীবনের কি করে আশা করতে পারে এবং অন্য গ্রহে গিয়ে পরবর্তী জীবনের তো কথাই নেই? বিভিন্ন

রকমের স্বর্গলোকে সুখভোগ করার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন রকমের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে সব দিক দিয়েই অসীম সুখভোগ করা যায়। কিন্তু সর্বোচ্চ সুখ কেবল তখনই অনুভব করা যায়, যখন কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে, ভগবানের চিন্ময় ধামে ভগবানের সাহচর্য লাভ করে ভগবানের সেবা করা যায়। তাই কৃষ্ণভক্তি সাধন করাটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ এবং সব রকম সমস্যার সমাধান করার সেটি শ্রেষ্ঠ উপায়।

শ্লোক ৩২

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

এবম্—এভাবে; **বহুবিধাঃ**—বহুবিধ; **যজ্ঞাঃ**—যজ্ঞ; **বিততাঃ**—বিস্তৃত; **ব্রহ্মণঃ**—বেদের; **মুখে**—মুখে; **কর্মজান্**—কর্মজাত; **বিদ্ধি**—জানবে; **তান্**—তাদের; **সর্বান্**—সকলকে; **এবম্**—এভাবে; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **বিমোক্ষ্যসে**—মুক্তি লাভ করতে পারবে।

গীতার গান

হে পুরুষোত্তম! অতঃ যজ্ঞই যে ধর্ম ।
আর সব যাহা কিছু সকল বিকর্ম ॥
বেদাদি শাস্ত্রেতে তথা বহু যজ্ঞ হয় ।
কত শাখা প্রশাখাদি কে করে নির্ণয় ॥
সে সব যজ্ঞাদি জান সব কর্মজান ।
মুক্তিপথ সেই জান যজ্ঞ সে সর্বান ॥

অনুবাদ

এই সমস্ত যজ্ঞই বৈদিক শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে এবং এই সমস্ত যজ্ঞ বিভিন্ন প্রকার কর্মজাত। সেগুলিকে যথাযথভাবে জানার মাধ্যমে তুমি মুক্তি লাভ করতে পারবে।

তাৎপর্য

বিভিন্ন কর্মীর বিভিন্ন মনোবৃত্তি অনুসারে *বেদে* নানা রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ মানুষই তার দেহাত্মবুদ্ধিতে তন্ময় হয়ে আছে।

তাই, সমস্ত যজ্ঞের এমনভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে মানুষ তার দেহ, মন অথবা বুদ্ধির যোগ্যতা অনুসারে তাদের অনুষ্ঠান করতে পারে। কিন্তু সমস্ত যজ্ঞের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহের বন্ধন থেকে জীবকে মুক্ত করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে তাঁর নিজের মুখ থেকে সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্লোক ৩৩

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

শ্রেয়ান্—শ্রেয়; **দ্রব্যময়াৎ**—দ্রব্যময়; **যজ্ঞাৎ**—যজ্ঞ থেকে; **জ্ঞানযজ্ঞঃ**—জ্ঞানময় যজ্ঞ; **পরন্তপ**—হে শত্রু দমনকারী; **সর্বম্**—সমস্ত; **কর্ম**—কর্ম; **অখিলম্**—পূর্ণরূপে; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **জ্ঞানে**—জ্ঞানে; **পরিসমাপ্যতে**—সমাপ্ত হয়।

গীতার গান

কিন্তু শ্রেয় জ্ঞানযজ্ঞ দ্রব্য যজ্ঞাপেক্ষা ।
জ্ঞানীর নাহিক আর কর্মজ অপেক্ষা ॥
সর্ব কর্ম শেষ হয় জ্ঞানে সমাপন ।
কর্মশুদ্ধ চিত্তে হয় জ্ঞানের সাধন ॥

অনুবাদ

হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেয়। হে পার্থ! সমস্ত কর্মই পূর্ণরূপে চিন্ময় জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে।

তাৎপর্য

সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়ে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া এবং অবশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেম লাভ করে অপ্রাকৃত জগতে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর নিত্য সাহচর্য লাভ করা। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি যজ্ঞেরই একটি নিগূঢ় রহস্য আছে এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হলে সেই রহস্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া প্রয়োজন। অনুষ্ঠানকারীর বিশ্বাস ও বাসনা অনুসারে যজ্ঞ বিভিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভ করার কামনায় কেউ যখন জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞ অপ্রাকৃত জ্ঞানরহিত কর্মযজ্ঞের থেকে শ্রেয়, কেন না

জ্ঞানবিহীন যজ্ঞ লৌকিক ক্রিয়া মাত্র—তাতে পরমার্থ লাভ হয় না। প্রকৃত জ্ঞান সর্বোচ্চ পর্যায়ের অপ্রাকৃত জ্ঞানে অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনায় পরিসমাপ্তি হয়। জ্ঞানের স্তরে উন্নীত না হলে যজ্ঞানুষ্ঠান কেবলমাত্র জাগতিক কার্যকলাপ। যখন যজ্ঞের সকল কাজকর্ম অপ্রাকৃত জ্ঞানের স্তরে উন্নীত করে, তখন তার সুফল পারমার্থিক পর্যায়ে পর্যবসিত হয়। স্তরভেদে যজ্ঞ-ক্রিয়াকে কর্মকাণ্ড (সকাম কর্ম) অথবা জ্ঞানকাণ্ড (সত্য-জিজ্ঞাসা) বলা হয়। কিন্তু সেই যজ্ঞই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, যার ফলে পরম জ্ঞান লাভ করা যায়।

শ্লোক ৩৪

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

তৎ—বিভিন্ন যজ্ঞের সেই জ্ঞান; **বিদ্ধি**—জানবার চেষ্টা কর; **প্রণিপাতেন**—সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে; **পরিপ্রশ্নেন**—ঐকান্তিক বিনম্র প্রশ্নের দ্বারা; **সেবয়া**—সেবার দ্বারা; **উপদেক্ষ্যন্তি**—উপদেশ দান করবেন; **তে**—তোমাকে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **জ্ঞানিনঃ**—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা; **তত্ত্ব**—তত্ত্ব; **দর্শিনঃ**—দ্রষ্টাগণ।

গীতার গান

অতএব সে বিজ্ঞান যে জানিবারে চায় ।
উপযুক্ত গুরুপদ করয়ে আশ্রয় ॥
প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন সেবার সহিত ।
গুরুস্থানে জানি লও আপনার হিত ॥

অনুবাদ

সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর। তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষেরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।

তাৎপর্য

পারমার্থিক উপলব্ধির পথ নিঃসন্দেহে দুর্গম। তাই, ভগবান আমাদের উপদেশ দিয়েছেন সেই সদ্গুরুর শরণাগত হতে, যিনি গুরু-পরম্পরার ধারায় ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান

লাভ করেছেন। গুরু-পরম্পরাক্রমে যিনি ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেননি, তিনি কখনই গুরু হতে পারেন না। ভগবান হচ্ছেন আদি গুরু। তিনি এই পরম তত্ত্বজ্ঞান সৃষ্টির আদিতে দান করেছিলেন। তারপর গুরু-শিষ্য ধারায় পরম্পরাক্রমে এই জ্ঞান প্রবাহিত হয়ে আসছে। তাই, এই পরম্পরার ধারায় যিনি এই জ্ঞান আহরণ করেছেন, তিনি এই জ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং তিনিই এই জ্ঞানকে যথাযথরূপে দান করতে পারেন। মনগড়া একটি পদ্ধতির উদ্ভাবন করে আমরা কখনই ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারি না। একদল মূঢ় প্রতারক গুরু সেজে নানা রকম অশাস্ত্রীয় পদ্ধতির উদ্ভাবন করে লোক ঠকায়। এই জন্য *ভাগবতে* (৬/৩/১৯) বলা হয়েছে, *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্*—ধর্মের পথ স্বয়ং ভগবানই প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ করেছেন। তাই, জল্পনা-কল্পনা বা বৃথা তর্ক অথবা শাস্ত্রগ্রন্থের মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে কখনই আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না। পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা গুরুদেবের শরণাগত হতে হয়, সুদৃঢ় বিশ্বাসে তাঁর চরণাম্বুজে আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং সম্পূর্ণ নিরহঙ্কারী হয়ে ক্রীতদাসের মতো তাঁর সেবা করতে হয়। সদ্‌গুরুর সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করা যায়। আত্মসমর্পণ ও সেবা না করে কেবল প্রশ্ন করে কখনই এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। গুরুদেব পরীক্ষা করে দেখেন শিষ্যের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার বাসনা কতটা প্রবল হয়েছে এবং এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই গুরুদেব তাঁর শিষ্যকে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার আশীর্বাদ দান করেন। এখানে অন্ধের মতো অনুকরণ করা অথবা মূঢ়ের মতো নিরর্থক প্রশ্ন করার নিন্দা করা হয়েছে। শিষ্য কেবল শ্রদ্ধা সহকারে গুরুপ্রদত্ত উপদেশ শ্রবণ করবে, তা নয়, তাকে আত্মসমর্পণ, গুরুদেবের ঐকান্তিক সেবা এবং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার মাধ্যমে এই জ্ঞানের মর্ম উপলব্ধি করতেও হবে। সদ্‌গুরু সর্বদাই তাঁর শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত কৃপা পরায়ণ। তাই শিষ্য যখন বিনীত ও আজ্ঞানুবর্তী সেবায় সর্বতোভাবে তৎপর হয়, তখন জ্ঞান ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার বিনিময় পূর্ণ হয়।

শ্লোক ৩৫

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব ।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

যৎ—যা; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **ন**—না; **পুনঃ**—পুনরায়; **মোহম্**—মোহ; **এবম্**—এই প্রকার; **যাস্যসি**—প্রাপ্ত হবে; **পাণ্ডব**—হে পাণ্ডুপুত্র; **যেন**—যার দ্বারা; **ভূতানি**—জীবসমূহ; **অশেষাণি**—সমস্ত; **দ্রক্ষ্যসি**—দর্শন করবে; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **অথো**—অর্থাৎ; **ময়ি**—আমাতে।

গীতার গান

সে সব জ্ঞানের কথা বুঝিতে পারিলে ।
মোহ আর হবে নাহি হারিলে জিতিলে ॥
তখন সে আত্মাদৃক দেখে ব্রহ্মসম ।
সম্পূর্ণ দর্শন সেই সম্পর্ক সে সম ॥

অনুবাদ

হে পাণ্ডব! এভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তুমি আর মোহগ্রস্ত হবে না, কেন না এই জ্ঞানের দ্বারা তুমি দর্শন করবে যে, সমস্ত জীবই আমার বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ তারা সকলেই আমার এবং তারা আমাতে অবস্থিত।

তাৎপর্য

তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরুর কাছ থেকে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে শিষ্য বুঝতে পারে যে, সকল জীবই হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। শ্রীকৃষ্ণ থেকে আলাদা অস্তিত্ব থাকাকে বলা হয় মায়া। *মা* শব্দের অর্থ হচ্ছে 'না' আর *য়া* শব্দের অর্থ হচ্ছে 'যা' অর্থাৎ 'যার কোন অস্তিত্ব নেই'। কেউ কেউ মনে করে, আমাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজন নেই। তাদের মতে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একজন মহান ঐতিহাসিক পুরুষ এবং পরমতত্ত্ব হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম। কিন্তু *ভগবদ্গীতার* মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর মূল কারণ। *ব্রহ্মসংহিতায়* স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান, সর্ব কারণের কারণ। অনন্ত কোটি অবতারেরাও হচ্ছেন তাঁর বিভিন্ন অংশ-প্রকাশ মাত্র। তেমনই, সকল জীবও হচ্ছে ভগবানের অংশ-প্রকাশ। মায়াবাদী দার্শনিকেরা ভুল করে মনে করে যে, বিভিন্ন অংশ-প্রকাশের মাধ্যমে প্রকট হবার ফলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন। এটি হচ্ছে প্রাকৃত চিন্তাধারা। প্রাকৃত জড় জগতে আমাদের

অভিজ্ঞতা এই যে, যখন কোন কিছু খণ্ডরূপে পরিবেশিত হয়, তখন তার মূল স্বরূপ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মায়াবাদী দার্শনিকেরা এটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না যে, ভগবান হচ্ছেন পরতত্ত্ব, তিনি হচ্ছেন অনন্ত। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে এক যোগ করলেও তাঁর কোন বিকার হয় না, আবার তাঁর থেকে এক বিয়োগ করলেও তাঁর কোন বিকার হয় না। এটিই হচ্ছে অপ্রাকৃত তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য।

পর্যাপ্ত পারমার্থিক জ্ঞান না থাকার ফলে আমরা বর্তমানে মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছি এবং তারই ফলে আমরা মনে করি, আমরা শ্রীকৃষ্ণের থেকে বিচ্ছিন্ন। আমরা যদিও শ্রীকৃষ্ণের ভিন্নাংশ কিন্তু তবুও আমরা শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন নই। জীবের দেহগত পার্থক্য হচ্ছে মায়া, অর্থাৎ তার সত্যিকারের অস্তিত্ব নেই। আমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করা। মায়ার প্রভাবে অর্জুন মনে করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিত্য চিন্ময় সম্পর্ক অপেক্ষা তাঁর দেহগত সম্বন্ধে যারা তাঁর আত্মীয়, তারা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। *ভগবদ্গীতার* সমস্ত উপদেশই আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে, জীব হচ্ছে ভগবানের নিত্যকালের সেবক এবং সে শ্রীকৃষ্ণ থেকে দূরে সরে থাকতে পারে না। সে যদি মনে করে, সে শ্রীকৃষ্ণ থেকে আলাদা, সেটিই হচ্ছে মায়া। ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে জীবদের বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। অনন্তকাল ধরে সেই উদ্দেশ্যকে ভুলে যাওয়ার ফলেই তারা কখনও মানুষ কখনও পশু কখনও দেবতা আদি রূপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সেবার কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই এই দেহগত পার্থক্যের উদয় হয়। কিন্তু কেউ যখন কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হন, তখন তিনি এই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এই শুদ্ধ পারমার্থিক জ্ঞান কেবল সদ্গুরুর কাছ থেকেই লাভ করা যায়। এই জ্ঞানের প্রভাবেই কেবল জীব শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ, এই মোহ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। পরম তত্ত্বজ্ঞান হচ্ছে সেই জ্ঞান, যার প্রভাবে আমরা জানতে পারি যে, পরম আত্মা শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম আশ্রয়। এই পরম আশ্রয় হারিয়ে ফেলার ফলেই জীবসমূহ তাদের নিজেদের পৃথক পরিচয় আছে, এরূপ কল্পনা করে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এভাবেই তারা একটির পর একটি দেহ ধারণ করে জগৎকে ভোগ করতে চায় এবং সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যায়। এই ধরনের মোহগ্রস্ত জীবেরা যখন ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে তাঁর শরণাগত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তারা মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছে। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে (২/১০/৬)* বলা হয়েছে—*মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*। মুক্তির অর্থ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসরূপে নিজের স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়া।

শ্লোক ৩৬

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

অপি—এমন কি; **চেৎ**—যদি; **অসি**—তুমি হও; **পাপেভ্যঃ**—পাপীদের থেকে; **সর্বেভ্যঃ**—সমস্ত; **পাপকৃত্তমঃ**—পাপিষ্ঠ; **সর্বম্**—এই প্রকার সমস্ত পাপকর্ম; **জ্ঞানপ্লবেন**—দিব্য জ্ঞানরূপ তরণীর দ্বারা; **এব**—অবশ্যই; **বৃজিনম্**—দুঃখরূপ সমুদ্র; **সন্তরিষ্যসি**—অতিক্রম করবে।

গীতার গান

পাপী হতে পাপী যদি হয়ে থাক তুমি ।
তথাপি জ্ঞানের পোতে তরিবে আপনি ॥

অনুবাদ

তুমি যদি সমস্ত পাপীদের থেকেও পাপিষ্ঠ বলে গণ্য হয়ে থাক, তা হলেও এই জ্ঞানরূপ তরণীতে আরোহণ করে তুমি দুঃখ-সমুদ্র পার হতে পারবে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি করা এতই মাধুর্যময় যে, তা অজ্ঞানতার সমুদ্রে যে জীবন-সংগ্রাম, তা থেকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে। এই জড় জগৎকে কখনও অবিদ্যার সমুদ্র অথবা কখনও দাবানলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। অতি সুদক্ষ সাঁতারুও যেমন সাঁতার কেটে সমুদ্র পার হতে পারে না, ঠিক তেমনই জড় জগতের যে জীবন-সংগ্রাম তা দুরতিক্রম্য। মাঝ-সমুদ্রে যে মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে, তার উদ্ধারের একমাত্র উপায় হচ্ছে, যদি কেউ এসে তাকে তুলে নেয়। এই ভবসমুদ্রে আমরাও সেই রকম হাবুডুবু খাচ্ছি। এখন কেউ যদি কৃপাপরবশ হয়ে আমাদের এই ভবসমুদ্র থেকে তুলে নেয়, তা হলেই কেবল আমরা উদ্ধার পেতে পারি। ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া অপ্রাকৃত ভগবৎ-তত্ত্ব হচ্ছে একমাত্র মুক্তির পথ। এই ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান বা কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে আমাদের উদ্ধারকারী নৌকা। মুক্তি লাভের এই পথ অত্যন্ত সহজ, সরল ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ।

শ্লোক ৩৭

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন ।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

যথা—যেমন; **এধাংসি**—দাহ্য কাঠ; **সমিদ্ধঃ**—সম্যক্‌রূপে প্রজ্বলিত; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **ভস্মসাৎ**—ভস্মীভূত; **কুরুতে**—করে; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **জ্ঞানাগ্নিঃ**—জ্ঞানরূপ অগ্নি; **সর্বকর্মাণি**—সমস্ত জড় কর্মফলকে; **ভস্মসাৎ**—ভস্মীভূত; **কুরুতে**—করে; **তথা**—তেমনই।

গীতার গান

প্রবল অগ্নিতে যথা কাষ্ঠ ভস্মসাৎ ।
জ্ঞানাগ্নি জ্বলিলে পাপ সকল নিপাত ॥
অতএব জ্ঞানতুল্য নাহি সে পবিত্র ।
তাহা নহে জড় জ্ঞান লাভ যত্রতত্র ॥

অনুবাদ

প্রবলরূপে প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করে, হে অর্জুন! তেমনই জ্ঞানাগ্নিও সমস্ত কর্মকে দগ্ধ করে ফেলে।

তাৎপর্য

যে জ্ঞান আত্মা ও পরমাত্মা এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়, তাকে এখানে অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই অগ্নি কেবল পাপ কর্মফলকেই দহন করে তাই নয়, তা পুণ্য কর্মফলকেও দহন করে তাদের ভস্মে পরিণত করে। কর্মের ফল নানা রকম হয়। কোন কোন কর্মের ফল অপরিণত, কোন কর্মের ফল পরিণত, কোন কর্মের ফল ইতিমধ্যেই ভোগ করা হয়ে গেছে, আবার কোন কোন কর্মের ফল পূর্বজন্মের থেকে সঞ্চিত হয়ে আছে। কিন্তু স্বরূপ উপলব্ধির পরম জ্ঞানের আগুনে তা সবই ভস্মীভূত হয়ে যায়। *বেদে (বৃহদারণ্যক উপনিষদ* ৪/৪/২২) বলা হয়েছে, *উভে উহৈবৈষ এতে তরত্যমৃতঃ সাধ্বসাধূনী*—"পাপ ও পুণ্য উভয় কর্মফল থেকেই পরিত্রাণ পাওয়া যায়।"

শ্লোক ৩৮

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

ন—কিছুই নেই; **হি**—অবশ্যই; **জ্ঞানেন**—জ্ঞানের; **সদৃশম্**—তুল্য; **পবিত্রম্**—পবিত্র; **ইহ**—এই জগতে; **বিদ্যতে**—বিদ্যমান; **তৎ**—তা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **যোগ**—যোগে; **সংসিদ্ধঃ**—সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ; **কালেন**—কালক্রমে; **আত্মনি**—আত্মায়; **বিন্দতি**—উপভোগ করেন।

গীতার গান

যোগসিদ্ধ সেই জ্ঞান চিন্ময় নির্মল ।
সে জ্ঞান লভিলে হবে আনন্দে বিহ্বল ॥

অনুবাদ

এই জগতে চিন্ময় জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছুই নেই। এই জ্ঞান সমস্ত যোগের পরিপক্ক ফল। ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে যিনি সেই জ্ঞান আয়ত্ত করেছেন, তিনি কালক্রমে আত্মায় পরা শান্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

জ্ঞানের তাৎপর্য হচ্ছে পরমার্থ উপলব্ধি। তাই, এই দিব্য জ্ঞানের মতো মহিমান্বিত ও নির্মল আর কিছুই নেই। আমাদের বন্ধনের কারণ হচ্ছে অজ্ঞান এবং মুক্তির কারণ হচ্ছে জ্ঞান। এই জ্ঞান হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির সুপক্ক ফল। এই জ্ঞান যিনি লাভ করেছেন, তাঁকে আর অন্যত্র শান্তির অন্বেষণ করতে হয় না, কেন না তিনি তাঁর অন্তস্তলে নিত্য শান্তি উপভোগ করেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, এই জ্ঞান ও শান্তি কৃষ্ণভাবনামৃতে পর্যবসিত হয়। *ভগবদ্গীতার* এই হচ্ছে চরম উপদেশ।

শ্লোক ৩৯

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

শ্রদ্ধাবান্—শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি; **লভতে**—লাভ করেন; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **তৎপরঃ**—সেই অনুষ্ঠানে অনুরক্ত; **সংযত**—সংযত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **লব্ধ্বা**—লাভ করে; **পরাম্**—অপ্রাকৃত; **শান্তিম্**—শান্তি; **অচিরেণ**—অচিরেই; **অধিগচ্ছতি**—লাভ করেন।

গীতার গান

শ্রদ্ধাবান যেই হয় লভে সেই জ্ঞান ।
সংযত ইন্দ্রিয় যার তৎপর সে হন ॥
সে জ্ঞান লভিলে শান্তি অচিরাৎ পায় ।
সংসারের যত ক্লেশ সব মিটে যায় ॥

অনুবাদ

সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হয়ে চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞানে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভ করেন। সেই দিব্য জ্ঞান লাভ করে তিনি অচিরেই পরা শান্তি প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

যিনি সুদৃঢ় বিশ্বাসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাবান, তিনিই কেবল কৃষ্ণভাবনামৃতের এই জ্ঞান লাভ করতে পারেন। শ্রদ্ধাবান তাঁকেই বলা হয় যিনি বিশ্বাস করেন যে, কৃষ্ণভক্তি সাধন করলে সমস্ত কর্ম সুসম্পন্ন হয়। ভগবদ্ভক্তি সাধন করলে জীবনের পরমার্থ সাধিত হয়। সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ভগবানের সেবা সম্পাদন এবং *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে*—এই মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে অন্তর সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয় এবং তখন হৃদয়ে এই শ্রদ্ধার উদয় হয়। এ ছাড়া, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার সময় আমাদের ইন্দ্রিয়-সংযম করতে হয়। যিনি ইন্দ্রিয়ের বেগগুলিকে সংযত করে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি অচিরেই কৃষ্ণভাবনামৃতের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ৪০

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

অজ্ঞঃ—শাস্ত্রজ্ঞান রহিত মূঢ়; **চ**—এবং; **অশ্রদ্দধানঃ**—শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন; **চ**—ও; **সংশয়**—সংশয়; **আত্মা**—ব্যক্তি; **বিনশ্যতি**—বিনষ্ট হয়; **ন**—না; **অয়ম্**—এই; **লোকঃ**—লোকে; **অস্তি**—আছে; **ন**—না; **পরঃ**—পরবর্তী জীবনে; **ন**—না; **সুখম্**—সুখ; **সংশয়**—সংশয়; **আত্মনঃ**—ব্যক্তির।

গীতার গান

সংশয়াত্মা অজ্ঞ যারা তাহে শ্রদ্ধা নাই ।
বিনাশ নিশ্চয় তার কহিনু নিশ্চয়ই ॥
সে সব লোকের নাই ইহ-পরকাল ।
সংশয়ী আত্মা সে দুঃখী সে সংসারজাল ॥

অনুবাদ

অজ্ঞ ও শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কখনই ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে না। সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তি ইহলোকে সুখভোগ করতে পারে না এবং পরলোকেও সুখভোগ করতে পারে না।

তাৎপর্য

সমস্ত প্রামাণ্য দিব্য শাস্ত্রের মধ্যে *ভগবদ্গীতাই* হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। যে সমস্ত মানুষের প্রবৃত্তি প্রায় পশুদের মতো, তাদের শাস্ত্রজ্ঞান অথবা শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে না। আবার এমনও কিছু লোক আছে, যাদের শাস্ত্রজ্ঞান থাকলেও বা শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারলেও, শাস্ত্রের কথায় তাদের বিশ্বাস নেই। শাস্ত্র থেকে বিভিন্ন শ্লোক উদ্ধৃত করে এরা নানা রকম যুক্তি-তর্কের অবতারণা করতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রের প্রতি তাদের মোটেই বিশ্বাস নেই। আবার আর এক ধরনের মানুষ আছে, যাদের *ভগবদ্গীতার* প্রতি বিশ্বাস থাকলেও তারা বিশ্বাস করে না যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর, তাই তারা তাঁর আরাধনা করে না। এই ধরনের মানুষদের মনে কৃষ্ণভাবনার উদয় হয় না। তারা অধঃপতিত হয়। এদের মধ্যে যাদের মোটেই বিশ্বাস নেই এবং যারা এই শাস্ত্রোক্ত বিষয় সম্বন্ধে সন্দিহান, তারা তাদের পারমার্থিক জীবনে কোন রকম উন্নতি লাভ করতে পারে না। ভগবান এবং তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণীর প্রতি যাদের শ্রদ্ধা নেই, তারা কখনই ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে না। তাই শ্রদ্ধা সহকারে শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের অনুগমন করে পরম জ্ঞান লাভ করাই হচ্ছে প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। পারমার্থিক উপলব্ধির অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত

হতে এই জ্ঞানই সাহায্য করবে। পক্ষান্তরে, সন্দিগ্ধচিত্ত মানুষদের পক্ষে পারমার্থিক মুক্তির কোনও মর্যাদা লাভ সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি মানুষেরই কর্তব্য হচ্ছে, গুরু-পরম্পরায় যে সমস্ত মহান আচার্য আছেন, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাফল্য লাভ করা।

শ্লোক ৪১

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ ।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

যোগ—কর্মযোগে ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **সংন্যস্ত**—ত্যাগ করেন; **কর্মাণম্**—কর্মফল; **জ্ঞান**—জ্ঞানের দ্বারা; **সংছিন্ন**—ছেদন করেন; **সংশয়ম্**—সংশয়; **আত্মবন্তম্**—আত্মবান; **ন**—না; **কর্মাণি**—কর্মসমূহ; **নিবধ্নন্তি**—আবদ্ধ করতে পারে; **ধনঞ্জয়**—হে ধনঞ্জয়।

গীতার গান

অতএব যোগ দ্বারা কর্মবিহীন ।
জ্ঞানলাভ দ্বারা হয় সংশয় বিলীন ॥
আত্মবান জ্ঞানবান কর্ম হতে মুক্ত ।
হে ধনঞ্জয়! তুমি সেই হও নিত্যমুক্ত ॥

অনুবাদ

অতএব, হে ধনঞ্জয়! যিনি নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা কর্মত্যাগ করেন, জ্ঞানের দ্বারা সংশয় নাশ করেন এবং আত্মার চিন্ময় স্বরূপ অবগত হন, তাঁকে কোন কর্মই আবদ্ধ করতে পারে না।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত *গীতার* জ্ঞানকে যিনি অনুসরণ করেন, এই দিব্য জ্ঞানের প্রভাবে তাঁর অন্তরের সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয়। ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হবার ফলে তিনি ইতিমধ্যেই আত্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত। তাই, তিনি নিঃসন্দেহে সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত।

শ্লোক ৪২

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **অজ্ঞানসম্ভূতম্**—অজ্ঞান থেকে উদ্ভূত; **হৃৎস্থম্**—হৃদয়স্থিত; **জ্ঞান**—জ্ঞানের; **অসিনা**—খড়্গের দ্বারা; **আত্মনঃ**—আত্মার; **ছিত্ত্বা**—ছিন্ন করে; **এনম্**—এই; **সংশয়ম্**—সংশয়; **যোগম্**—যোগে; **আতিষ্ঠ**—অধিষ্ঠিত হও; **উত্তিষ্ঠ**—যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াও; **ভারত**—হে ভরতবংশীয়।

গীতার গান

অজ্ঞানসম্ভূত মোহ জ্ঞান অসি দ্বারা ।
হৃদয়ে উদয় সব হইয়াছে যারা ॥
এই সব ছিন্ন করি জাগিয়া উঠিবে ।
হে ভারত! যোগোতিষ্ঠ হও এ সংসারে ॥

অনুবাদ

অতএব, হে ভারত! তোমার হৃদয়ে যে অজ্ঞানপ্রসূত সংশয়ের উদয় হয়েছে, তা জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা ছিন্ন কর। যোগাশ্রয় করে যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াও।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে যে যোগমার্গের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাকে বলা হয় 'সনাতন-যোগ' অর্থাৎ জীবের উপযোগী শাশ্বত কার্যকলাপ। এই যোগে দুই রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠান সাধিত হয়—তার একটি হচ্ছে দ্রব্যযজ্ঞ অর্থাৎ সব রকম জড় বিষয়কে উৎসর্গ করা এবং অন্যটি হচ্ছে আত্মজ্ঞান যজ্ঞ, যা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ পারমার্থিক কর্ম। দ্রব্যময়-যজ্ঞ যদি পারমার্থিক উদ্দেশ্যে সাধিত না হয়, তবে তা জড়-জাগতিক কর্মে পর্যবসিত হয়। কিন্তু এই যজ্ঞ যদি পরমার্থ সাধন করবার জন্য, অর্থাৎ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে সাধিত হয়, তবে তা সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। পারমার্থিক কর্মও দুটি ভাগে বিভক্ত—নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করা এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করা। *ভগবদ্গীতার* যথার্থ জ্ঞান লাভ করলে এই দুটি তত্ত্বকেই অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। তখন অনায়াসে উপলব্ধি করা যায় যে জীবাত্মা হচ্ছে ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই প্রকার উপলব্ধি

পরম মঙ্গলময়, কারণ এই জ্ঞানের প্রভাবে ভগবানের দিব্য লীলার তত্ত্ব সহজেই বুঝতে পারা যায়। এই অধ্যায়ের প্রথমেই ভগবান নিজেই তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপের কথা বর্ণনা করেছেন। *ভগবদ্গীতায়* নির্দেশিত ভগবানের উপদেশ যে বুঝতে পারে না, সে হচ্ছে শ্রদ্ধাহীন ভগবৎ-বিদ্বেষী। ভগবান যে তাকে একটুখানি স্বাধীনতা দিয়েছেন, সে তার অপব্যবহার করছে। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান এত সরলভাবে তাঁর স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে ভগবানের সচ্চিদানন্দময় স্বরূপকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, সে নিতান্তই মূর্খ। কৃষ্ণভাবনামৃতের সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করলে ধীরে ধীরে অজ্ঞানতা দূর হয়। দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রহ্মচর্য-যজ্ঞ, গার্হস্থ্য পালনরূপ যজ্ঞ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ যজ্ঞ, যোগাভ্যাস-যজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ ও স্বাধ্যায়-যজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণের দ্বারা অন্তরে কৃষ্ণভাবনামৃতের বিকাশ হয়। এই সব কয়টিকেই বলা হয় 'যজ্ঞ' এবং সব কয়টি ক্রিয়াই নিয়ন্ত্রিত কর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই সমস্ত ক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি। এই উদ্দেশ্যকে যিনি অনুসন্ধান করেন, তিনিই হচ্ছেন *ভগবদ্গীতার* যথার্থ শিষ্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে যার মনে সংশয় আছে, সে অধঃপতিত হয়। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যথার্থ সদ্গুরুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করে তাঁর সেবায় নিয়োজিত হয়ে, তাঁর কাছ থেকে *ভগবদ্গীতা* বা অন্য শাস্ত্রগ্রন্থ শিক্ষালাভ করা উচিত। সৃষ্টির আদি থেকে যে জ্ঞান গুরু-শিষ্য পরম্পরার ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে, তা আহরণ করতে হয় পরম্পরার ধারায় অধিষ্ঠিত যে সদ্গুরু, তাঁর কাছ থেকে। কোটি কোটি বছর আগে সূর্যদেবকে ভগবান যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই শিক্ষা তাঁর কাছ থেকে এই পৃথিবীতে নেমে এসেছে এবং সদ্গুরু তা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতভাবে দান করেন। তাই, *ভগবদ্গীতার* যথাযথ উপদেশ প্রত্যেকের গ্রহণ করা উচিত। যে সমস্ত প্রতারক তাদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য *ভগবদ্গীতার* জ্ঞানকে বিকৃত করে তার কদর্থ করে মানুষকে বিপথে চালিত করে, তাদের সম্বন্ধে সাবধান হওয়াই মানুষের কর্তব্য। ভগবান হচ্ছেন অবিসম্বাদিত পরমেশ্বর এবং তাঁর সমস্ত লীলাই অপ্রাকৃত। এই সত্যকে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনি *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান লাভ করার মুহূর্ত থেকেই মুক্ত।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—অপ্রাকৃত পারমার্থিক জ্ঞানের স্বরূপ উদ্ঘাটন বিষয়ক 'জ্ঞানযোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।